জাতবৈষ্ণব কথা

জাতবৈষ্ণব কথা

অজিত দাস

চারুবাক
ইউ-৬২, এস. এইচ. রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৮

প্রকাশক
জওহর-উল্-ইসলাম
চাকবাক
ইউ-৬২, এস. এইচ. রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৮

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৬০

মুদ্রাকর
এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন
কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ : অমল পাত্র

উৎসর্গ

মা ও বাবার
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

আত্মপক্ষ

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে বঙ্গদেশে যে বৈষ্ণবসমাজ গড়ে উঠেছে, তা নানা দল-উপদলে বিভক্ত। তারই একটি উপদল বা শাখা হচ্ছে জাতবৈষ্ণব সম্প্রদায়। এঁরা চৈতন্যোপাসক। কিন্তু বর্ণাশ্রমবিরোধী। যে কোনও বর্ণের বা ধর্মের মানুষ বৈষ্ণবতা গ্রহণ করে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারেন এবং জাতবৈষ্ণব-সমাজের দ্বারা গৃহীত হয়ে যাবেন। এঁদের ধর্মীয় আচরণ বর্ণাশ্রমী হিন্দুদের থেকে ভিন্ন। এঁরা ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দ্বারা চালিত নন। এঁদের বিবাহ এবং মৃতের সৎকার-এর রীতি ভিন্ন। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মও অন্য রকম। শ্রাদ্ধকর্ম, পিণ্ডদান এবং হোম-যজ্ঞাদিতে এঁরা বিশ্বাসী নন। এঁরা ব্রাহ্মণ, উচ্চবর্ণীয় হিন্দু এবং বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবসমাজ কর্তৃক নিন্দিত, ধিক্কৃত। এঁদের বলা হয়েছে ব্রাত্য, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, সমাজ-বহির্ভূত, অনাচারী এবং জারজ। এঁরা কারা, কেনই বা এঁদের নামে এমন অপবাদ বর্ষণ ?

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পঞ্চশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এ বিষয়ে আমি একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করেছিলাম আমার কাছের মানুষ স্নেহভাজন গবেষক অধ্যাপক ডঃ সুধীর চক্রবর্তীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। তিনি সেটি কলকাতার 'বারোমাস' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অশোক সেন মহাশয়ের হাতে সঁপে দেন এবং সম্পাদক মহাশয় তাঁর পত্রিকায় তা ছাপেন। নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে মনে সঙ্কোচ ছিল খুব। কিন্তু শ্রীচৈতন্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তিনি নিবন্ধটি বিষয়ে সবিশেষ প্রশংসা করলেন। শুনে মনে একটু ভরসা জাগল। আরও কিছু তথ্য সংগ্রহের বাসনা জাগল মনে। কিন্তু পাঁচশো বছরের সামাজিক উত্থান-পতন, আলোড়ন-আন্দোলনের তথ্য-সংগ্রহ দুঃস্বপ্ন মাত্র। যে কোনও তথ্যসংগ্রহ ও সমীক্ষার কাজে অর্থ এবং

সামর্থ্যের একান্ত প্রয়োজন। আমার দু'টোরই অভাব। পণ্ডিত নই যে পুঁথিপত্র ঘাঁটতে পারব। আমাকে যেতে হবে জাতবৈষ্ণব-সমাজের মানুষের কাছে। সাধ্যমতো তাই করেছি কয়েক বছর ধরে। তা করতে গিয়ে মনে হয়েছে, এঁরা নিছক নিন্দার পাত্র নন। এঁদের একটি সংগ্রামী ভূমিকা আছে। প্রথমত বর্ণাশ্রমী ব্যবস্থা বৈষম্যবাদী। আমরা যখন সগর্বে মন্ত্র হিসাবে উচ্চারণ করছি—অন্ধকার থেকে আলোকে চলো, অসত্য থেকে জ্ঞানের রাজ্যে চলো, মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে চলো—তখনও সমাজে জাতপাত-ভেদাভেদ রক্ষা করছি, তখনও ব্রাত্য, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ বলে দূরে ঠেলে রাখছি অন্যকে।

শ্রীচৈতন্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এই জাতবৈষ্ণব-সমাজ এরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেদিন। শ্রীচৈতন্যের নাম নিয়ে এরা পতিতোদ্ধারে ব্রতী হয়েছিল। বৈষ্ণবতায় আশ্রিত আরও অনেক দলই এ পথে নেমেছিল। কিন্তু আর কেউ এমন সুসংহত সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি। কয়েক শতাব্দী ধরে এই সমাজ টিকে আছে এবং পুষ্টিলাভ করেছে। এই সমাজের দু'টি ভাগ। একটি গৃহী জাতবৈষ্ণব-সমাজ, অন্যটি আখড়া-কেন্দ্রিক—বাবাজী বৈষ্ণবী অধ্যুষিত। একদা গৃহীরাও আখড়া-কেন্দ্রিক ছিলেন। এখন সে-সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন। বিশেষত শিক্ষিত সমাজ আখড়ার সঙ্গে সম্পর্করহিত হয়ে পড়েছেন। গৃহী সমাজ রক্ষণশীল। প্রধানত নিন্দা ধিক্কার যা কিছু—তা সবই আখড়ার বিরুদ্ধে। আখড়াই এই সমাজগঠনের মূলকেন্দ্র। আখড়ার বাবাজীদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সবই ধোয়া তুলসী পাতা নয়। সমাজের কোথায় বা তা মেলে? সমাজ থেমে নেই। বিবর্তিত হয়ে চলেছেই। সেই বিবর্তন-ধারায় কয়েক শত বৎসর ধরে আখড়া কোন ভূমিকা নিয়েছে, সেটাই আজ নতুন করে ভেবে দেখার প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়েছে। আমি প্রধানত গৃহী জাতবৈষ্ণবদের বর্তমান অবস্থান বিষয়েই তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাও অতি সামান্য। সেই সামান্য পুঁজিই এই গ্রন্থ-মধ্যে পরিবেশন করেছি। সহৃদয় পণ্ডিত সমাজ ও পাঠক সমাজকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রন্থটি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যা দেখেছি, জেনেছি এবং বুঝেছি, সেটাই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি জাতবৈষ্ণব-সমাজ সম্পর্কে

একটি রূপরেখা তুলে ধরতে। অজ্ঞতাবশত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভ্রান্তি থাকলে পাঠকবৃন্দের কাছ থেকে সংশোধন-প্রত্যাশী। কাউকে অসম্মান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবু যদি কেউ এই রচনার জন্য কোনো কারণে আহত হন, তাহলে তাঁর কাছে আমি নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার অভিজ্ঞতায় জেনেছি, জাতবৈষ্ণব-সমাজ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা সীমাবদ্ধ। ধারণা যদিও কিছু থাকে, তবে তা অনেকাংশেই বিকৃত, ভুল ধারণা। শিক্ষিত জাতবৈষ্ণবেরা সমাজের বিকৃত ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে আত্মপরিচয় গোপন করে হীনমন্যতায় ভোগেন। অথচ জাতপাত-ভেদাভেদবিরোধী উদার মানবিকতার সপক্ষে সংগ্রামে পূর্বপুরুষরা যে কায়মনোবাক্যে ব্রতী হয়েছিলেন, সেই উত্তরাধিকারের কথা ভুলে যান। একদিন এই সম্প্রদায় যা চেয়েছিলেন এবং বহু প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যা করেছিলেন, আজ অনৈক্যের চোরাবালিতে হাবুডুবু খাওয়া, বৈষম্যের বিষে জর্জর সমাজ তাই চাইছে।

রচনাটি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৯৯২ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বহুলাংশে সংযোজিত ও পরিমার্জিত করা হলো। এই সুযোগে 'বারোমাস' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অশোক সেন এবং 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ সাহেবকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যাঁদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। শ্রী রবি বিশ্বাস এবং শ্রী সুধীর চক্রবর্তী এই কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁরা আমার স্নেহভাজন, নিকটজন, তাই তাঁদের স্মরণ করলাম মাত্র। পরিশেষে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি আশরফ চৌধুরী সাহেবের নাম। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার এই রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

পাত্র বাজার
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

অজিত দাস

এই লেখকের কয়েকখানি গ্রন্থ :

সামুদ্রিক

ভাগফল

ক্রৌঞ্চনিষাদ

অজ্ঞাতবাস ও অন্যান্য গল্প

জাতবৈষ্ণব কথা

প্রথম পর্ব

মাথায় টিকি, নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠি, হাতে জপমালা, মুখে কৃষ্ণনাম। এই তো বৈষ্ণব। আমার যে ওসব কোনো চিহ্নই নেই! তবু আমি বৈষ্ণব? ভগ্নীপতি মহান্তমশায় বললেন—তা বৈষ্ণব বৈকি। পুরুষানুক্রমিক। পূর্বপুরুষ আগের সমাজ ছেড়ে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছিল। তারপর থেকে যে এই বংশে জন্মাবে, সে-ই বৈষ্ণব।

জন্মসূত্রে? তাই তো। সমাজের সবাই তো সেভাবেই পরিচিত। পৃথিবীর সব মানুষই। অতএব আমি বৈষ্ণব।

বাবাকে এক সময়ে প্রশ্ন করেছিলাম—আমাদের এই পরিবারের আদিপুরুষ কে? কত পুরুষ আগে তিনি?

বাবা বলেছিলেন—আমাকে নিয়ে সাত পুরুষের কথা বলতে পারি। সম্ভবত উর্ধ্বতম এই সপ্তম পুরুষই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

—তাঁর পূর্বাশ্রমের পরিচয় কি ছিল?

—তা তো বলতে পারব না। কথায় বলে, জাত হারিয়ে বোষ্টম। এ কথার অর্থ অবশ্য ভিন্ন। কদর্থক। আমরা বলব, জাত ছেড়ে দিয়ে বৈষ্ণব হয়েছি। ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হলে তার পূর্বপরিচয়, নামধাম, কুলমান, গোত্র, সব ছেড়ে দিতে হয়। পূর্বপরিচয় মুছে দিতে হয় একেবারে। সে-পদবি এবং নামও আর থাকে না। নতুন নামকরণ হয়। নতুন পদবি হয়। পূর্বাশ্রম-কথা বলা নিষেধ। সে বৈষ্ণব, এই মাত্র পরিচয়। মহাপ্রভু বলতেন, 'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাই।' অর্থাৎ বৈষ্ণব একজাতি। বৈষ্ণবের জাতিবিচার নেই। ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ লুপ্ত। নানা বর্ণের মানুষ ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছে। তখন দেশে চৈতন্যপ্রেমের জোয়ার নেমেছিল। 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে' ভেসে যায়।' সারা বাঙলাই ভেসে গিয়েছিল। আকাশে বাতাসে শুধু কীর্তনের সুর—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম। সেই ঢেউ-এর প্রভাবেই আমরা বৈষ্ণব পরিবার।

—আমাদের সেই আদিপুরুষ ভগবৎপ্রেমে মত্ত হয়ে বৈষ্ণব হয়েছিলেন, না অন্য কোনো সামাজিক কারণ ছিল?

—তা তো বলা যাবে না। পূর্বাশ্রমের পরিচয়ই যে অজানা। সামাজিক

কারণেও হতে পারে।

—তাঁর বৃত্তি কি ছিল ?

—মনে হয়, কৃষিজীবী। সঠিক বলা কঠিন। তবে বিষয়-সম্পত্তি কিছু ছিল। পারিবারিক হালচাল দেখে তাই অনুমিত হয়।

—কোন বর্ণের মানুষ ছিলেন বলে মনে হয় ?

—সে তো ছ' পুরুষ আগের কথা। আমরা এখন চাকরিজীবী সমাজভুক্ত মানুষ। আদিপুরুষ মধ্যম বর্ণ হতে পারে, নিম্নবর্ণও হতে পারে।

—মধ্যম বর্ণ কি ?

—নবশাক সমাজ। আবার নেড়ানেড়ীও হতে পারে।

—সেটা কি ?

—বৌদ্ধ।

—আমরা বৌদ্ধ ছিলাম ?

—হতে পারে। বৌদ্ধ থেকে বৈষ্ণব হয়েছি।

—উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিলাম না ?

—মনে হয় না। তাহলে একটা খানদানী ভাব থাকত। পূর্বাশ্রম-কথা জাহির করত। তাকে ত্যাগ করলেও। তাছাড়া উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে মিশতে যাবে কেন ? হাতে-পাওয়া বিশেষ সুযোগসুবিধা কেউ কি ছাড়তে চায় ? তারা বৈষ্ণব হলে গুরুগিরি করবে। গোঁসাই হবে। আরও উঁচুতে উঠতে চাইবে। জাতবৈষ্ণবের খাতায় নাম লেখাবে কেন ?

—নিম্নবর্ণ থেকে বৈষ্ণব হলে গোঁসাই মহান্ত হতে পারে না ?

—উচ্চবর্ণের হলে পাকা ব্যবস্থা। নিম্নবর্ণের হলে নরক ঘাঁটা। মহান্ত হলে হবে ছোটলোকের মহান্ত। ওপরতলাতে মান পাবে না। তবে আমার দিদিমার বাবা ছিল বামুন। চট্টোপাধ্যায় পদবি ছিল। তা থেকে মহান্ত হয়েছিল।

—বামুন ছিল ?

—হ্যাঁ। বামুন থেকে বৈষ্ণব। কবিরাজি করত। সেজন্য দিদিমা কবিরাজি চিকিৎসা জানত।

—বৈষ্ণব হয়ে লাভ কি হয়েছে বাবা ?

—যিনি হয়েছিলেন, তিনিই এর উত্তর দিতে পারতেন। তবে আমরা শ্রীচৈতন্যের মতো একজন মহাপুরুষের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়েছি। অতঃপর বাবা আবৃত্তি করতেন :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদাহরি ॥

বাবা বলতেন—এইখানে একটা কথা বলা দরকার। এখন যুগ পরিবর্তিত। সদা হরিনাম কীর্তন করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়। বিকল্প হিসাবে কীর্তন করতে হবে। সততা, ন্যায়, নিষ্ঠা আর মানবিকতার। এছাড়া বৈষ্ণব হয়ে আরেকটা লাভ হয়েছে। বামুন-পুরুতের হাত থেকে বেঁচেছি। চারদিকে দেখ তো কি রকম সব কাণ্ড করে। পুজোপার্বণ বিয়ে শ্রাদ্ধতে লোকে ভয়ে মরে পুরুতের দাপটে। আমাদের ওপর ওদের কর্তৃত্ব নেই। ওদের শাস্ত্র আর আচারের অধীন নই আমরা। আমাদের পুজো আমরাই করি। তোমার ঠাকমাই করে। পুরুত লাগে না। আমাদের নীতি হচ্ছে :

না করিবে অন্যদেবের নিন্দন বন্দন।
না করিবে অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ ॥

আমাদের অত দেবদেবীও নেই। রাধাকৃষ্ণ আর নিতাই গৌর, ব্যস। বামুন পুরুত সর্বনাশা। ওদের মন্ত্রই হচ্ছে—ব্রাহ্মণায় দদ। শুধু দাও আর দাও।

গলায় কণ্ঠি, নাকে রসকলি, হাতে জপমালা—ঠাকমা। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম মুখস্থ। কখনও কণ্ঠে কীর্তনের সুর। ঠাকুর-দেবতার পুজো তিনিই করতেন। জন্মাষ্টমী আর দোল পূর্ণিমায় বাড়িতে জাঁকিয়ে পুজো হতো। জন্মাষ্টমীর দিন পিতলের গামলা ভরা তালের বড়া নিয়ে ঠাকমা পুজোয় বসতেন। আমরা নেচে নেচে গাইতাম—তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচে রে। ঠাকমা পুজো করতেন। পুরুত—মেয়ে পুরুত।

—বাবা, মেয়ে পুরুত হয়?

—আমাদের ঘরে হয়। এটা মহাপ্রভুর কৃপা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা আইন করে দিয়েছিলেন যে শূদ্র আর স্ত্রীজাতির বেদপাঠ, শাস্ত্রচর্চা আর পূজার্চনার অধিকার নেই। তাদের পক্ষে এসব কর্ম নিষিদ্ধ। বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজে স্মার্ত পণ্ডিতদের ঘোষিত নীতি আজও মান্য হয়ে আছে। কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের একদিন আলোচনা হলো :

ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥
অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥

অদ্বৈতর বাক্য শুনি করিলা হুংকার।
প্রভু বোলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥
(বৃন্দাবন দাসঠাকুর : শ্রীচৈতন্যভাগবত)।

মহাপ্রভুর এই কৃপাতেই বৈষ্ণবসমাজে মেয়েদের মান বেড়ে গেলো। নিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী জাহ্নবা দেবী, অদ্বৈত প্রভুর স্ত্রী সীতা দেবী—বৈষ্ণবগুরু হয়ে গেলেন। বৈষ্ণব-আন্দোলনের নেত্রী হলেন তাঁরা। পুজোপাঠের, শাস্ত্রচর্চার অধিকার পেয়ে গেলেন। বৈষ্ণবসমাজের মেয়েরা বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্রচর্চা—সব কিছুই করতে লাগলেন। তাই তোমার ঠাকমা পুজো করে। মেয়ে পুরুত।

বাবা মুখে যাই বলুন, মনে তাঁর দ্বিধা ছিল।

গ্রামে একটা আখড়া ছিল। সেই আখড়ার অধীন ছিল গ্রামের সব বৈষ্ণব পরিবার। আখড়ার মহান্ত বাবাজীই ছিলেন সমাজের পুরোহিত। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া, সব কাজই সমাধা করতেন তিনি। হঠাৎ কি হলো, বাবা আখড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। একা নন। যে ক'টি শিক্ষিত পরিবার ছিল, সকলে একযোগে পরিত্যাগ করলেন আখড়াকে। সব ক'জনই শিক্ষিত এবং সমাজে প্রভাবশালী। ফলে রাধাগোবিন্দ মহান্ত বাবাজী নীরবতা পালন করলেন।

বাবা তখন বলতে লাগলেন—মহান্ত কিছু জানে নাকি? ও তো মূর্খ। আখড়ায় যারা জোটে, সব ছোটলোক আর মূর্খ। তাদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা করে। পঙ্কজ ঠিক কথাই বলেছিল।

সে আরেক কাহিনী।

বাবা কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন শহরে। সেখানে উচ্চবর্ণের বিশিষ্ট পরিবারের একটি যুবক নবদ্বীপের বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক রামদাস বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। নাকে রসকলি, মাথায় টিকি, গলায় কণ্ঠি, হাতে জপমালা, পরনে ধুতি, গায়ে উড়ুনি—এই বেশে তিনি শহরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন বাবার সহপাঠী কলেজের কিছু ছাত্র যুক্তি করে বিকালবেলা পথের ওপর জনসমক্ষে সেই নবীন বৈষ্ণবকে ঘিরে ধরে হেনস্থা করেন, তাঁর নাকের রসকলি জিব দিয়ে চেটে তুলে দেন। আর কি ব্যঙ্গবিদ্রূপ!

সেই যুবকরাই কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণ মিশনের গৈরিক বসনধারী মুণ্ডিতমস্তক এক স্বামিজীকে নিয়ে এসে জাঁকিয়ে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পালন করলেন। সেই যুবকদের একজন পঙ্কজ। তিনি বাবাকে বলেছিলেন—চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম হচ্ছে

চাষাভুষোর ধর্ম। আর দেখো, রামকৃষ্ণের ধর্ম শিক্ষিত ভদ্রলোক-সমাজের ধর্ম। বৈষ্ণবধর্ম অনাচারী।

ওই বৈষ্ণব নিগ্রহ আর ওই মন্তব্য বাবা ভুলতে পারেন নি। হয়তো প্রতিবাদী হওয়া উচিত ছিল। ঘটেছিল বিপরীত প্রতিক্রিয়া। তিনি আখড়ার সংস্রব ত্যাগ করলেন। বাবার ভেক হয়েছিল। আমার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন আখড়ার বাবাজী মালসা ভোগ আর সংকীর্তন দিয়ে। আমার ভেক হলো না।

এর পরই বাবা-মা দীক্ষা নিলেন শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশের গোস্বামীর কাছে। বংশে সেই প্রথম ব্রাহ্মণের অনুপ্রবেশ ঘটল গুরু হিসাবে।

মা শহরের শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। তিনি বললেন—আমরা উচ্চবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত। এখন খুব ভালো হলো।

বাবা বললেন—আখড়ার হাত থেকে মুক্ত। বলতেও লজ্জা, ভাবতেও কেমন লাগত।

—হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ গুরু হলো। মানুষকে বলা যাবে।

—অদ্বৈত বংশ গো। মহাবৈষ্ণব বংশ। পুণ্যশ্লোক।

মা বললেন—এবার ব্রাহ্মণ দিয়ে বাড়িতে নারায়ণ পুজো দেবো। পাড়ায় লোকে কত রকম পুজো দেয়। বামুন পুরুত এসে পুজো করে। আমাদের নিজেদের পুজো করা! মেয়েমানুষের পুজো করা! ধেৎ!

মুশকিল বাধল এখানেই। কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতই রাজি নয় জাতবৈষ্ণবের বাড়ি পুজো করতে। না গো, বোষ্টম বাড়িতে পুজো করতে পারব না। আমাদের যজমান নিয়ে কাজ, সমাজ নিয়ে বাস। তারা রাগ করবে। মা-র নারায়ণ পুজো দেওয়া হলো না। বাড়িতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রবেশ ঘটল আরও কিছুকাল পরে। বড় বোনের বিয়ের সময়।

তখনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পেশাদার পুরোহিত মেলে নি। শেষে এক শিক্ষিত চাকরিজীবী ব্রাহ্মণ যুবক রাজি হলেন। সমস্যা চুকল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করে বোনের বিয়ে হলো।

মা খুব খুশি। তিনি যা বললেন, তার অর্থ হলো, জাতে উঠলাম। বোনের বিয়ে কিন্তু জাতবৈষ্ণবের ঘরেই হলো। এ ছাড়া হবেই বা কোথায়? জাতি কুল ছেড়ে এখানে আসা। প্রত্যাবর্তনের সুযোগ কোথায়? কার মধ্যে যাওয়া যাবে? বস্তুত জাতবৈষ্ণব হিন্দুসমাজের ভিতর একটি বর্ণে পরিণত।

॥ দুই ॥

এখন একটি জেলা শহরে বাড়িঘর, বসবাস। একদিন পাড়ার এক ভাড়াটিয়া ভদ্রলোকের স্ত্রী আমার স্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন—আপনারা কি ?

স্ত্রী বলেছেন—আমরা বৈষ্ণব।

—বৈষ্ণব তো আমরাও। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমরা যেমন বামুন, তেমনি আপনাদের জাত কি ?

—আমরা বৈষ্ণব।

—শুধুই বৈষ্ণব, জাত নেই, সে আবার কি ? সে তো বাবাজীরা হয়। আখড়ায় থাকে, কপনি আঁটে। তিন-চারটে সেবাদাসী নিয়ে ফুর্তি করে, আর ভিক্ষে করে খায়।

স্ত্রী বাড়ি ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—কি লজ্জার কথা ! যখন সেবাদাসী আর ভিক্ষের কথা বলল, তখন লজ্জায় মরি। বললাম, আমরা তা নই। আমরা গেরস্ত মানুষ, ভদ্দরলোক, গৃহী বৈষ্ণব। মহিলা বললেন, কি জানি ! গৃহী বৈষ্ণব তো আমরা বলেই জানি। অন্য জাত নেই। শুধু বৈষ্ণব বলে জাত তো জানি না।

স্ত্রী ভুল করেছেন। বলা উচিত ছিল—আমরা জাতবৈষ্ণব। গৃহী বৈষ্ণব বলতে লোকে বোঝে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বর্ণাশ্রমী সমাজের মানুষকে। হওয়া উচিত, বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব আর জাতবৈষ্ণব। কারণ গৃহী দু'পক্ষই।

ব্যাপারটা কি আমিই জানতাম ছাই। ঠেকে শেখা। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারী গবেষক অধ্যাপক ডঃ ওকনেল কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। একদিন আমার কাছে এসে উপস্থিত। 'দেশ' পত্রিকার কলা-সমালোচক স্নেহভাজন সন্দীপ সরকার পাঠিয়েছেন।

ওকনেল জানতে চান বৈষ্ণবসমাজের আচার-আচরণ সম্পর্কে। বললাম—সে-সব তো নবদ্বীপে পাবেন।

তিনি বললেন—নবদ্বীপে ছ'মাস ছিলাম। শাস্ত্র পড়েছি। এখন গৃহস্থের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চাই। আমার তখন এ বিষয়ে ধারণা বা জ্ঞানের পুঁজি প্রায় শূন্য। ভদ্রলোক দুপুরে এসেছেন। বিকালে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তিনি সাহায্যপ্রার্থী।

কাছেই এক অধ্যাপক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর বাবা একটি উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তিনি নবদ্বীপের এক বৈষ্ণবগুরুর শিষ্য। তাঁর কাছেই নিয়ে গেলাম ওঁকে। ভদ্রলোক সাহেব দেখে দিশেহারা। সাহেব বাঙলায় প্রশ্ন

করলে তিনি উত্তর দেন দাঁত-ভাঙা ইংরাজিতে। ওকনেল-এর প্রশ্ন এড়িয়ে তিনি বৈষ্ণবদর্শন বোঝাতে শুরু করলেন। ওকনেল বললেন—সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বলুন।

এবার গৃহী বৈষ্ণবের কথা উঠতেই আমি জাতবৈষ্ণবের কথা তুললাম। ভদ্রলোক বললেন—না। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত একমাত্র আমরাই গৃহী বৈষ্ণব। বললাম—তা কেন? ধর্মান্তরিত গৃহী বৈষ্ণব পরিবার? ভদ্রলোক এবার মুখ বিকৃত করে, ভঙ্গিতে ঘৃণা ছড়িয়ে বললেন—জাতবৈষ্ণব? ওরা বৈষ্ণবই নয়। বৈষ্ণব আমরা। বর্ণাশ্রম-বিশ্বাসী। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নির্দেশিত পথের অনুসারী। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব। অনভিজ্ঞতার কারণে মনে সেদিন ক্ষোভ জেগেছিল ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে।

কিন্তু ঠিক এমনি কথাই শুনতে হলো, নবদ্বীপে। আখড়ায় বসে এক বৃদ্ধ বাবাজীর মুখ থেকে। বৃদ্ধ বাবাজীও মুখ বিকৃত করে বললেন—জাতবৈষ্ণব? ওরা বৈষ্ণব নয়। অনাচারী, ভ্রষ্ট, অশ্রদ্ধেয়। বৈষ্ণব বলতে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবকেই বোঝায়।

॥ তিন ॥

বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি একটি দল?

কত দল, উপদল। স্ব স্ব প্রধান। কে কার বিচার করে? প্রথমে একটি দলই ছিল। নবদ্বীপে। বৈষ্ণব-আন্দোলনকারী বা ভক্তিবাদী দল। আদি নেতা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য। তারপর শ্রীগৌরাঙ্গই সর্ববাদিসম্মত নেতা। নবদ্বীপের জ্ঞানবাদী আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের আচরণের প্রতিবাদী হৃদয়বাদী আন্দোলন বলা যায় তাকে। মানবতাবাদীও বলা যায়।

ব্রাহ্মণের হাতে স্মৃতিশাস্ত্র রচনার ভার। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আচরণ-বিধি তৈরি করে দেবেন তাঁরা। সকলে বিনা প্রতিবাদে তাকেই মান্য করতে বাধ্য, তা সে যত আপত্তিকর, অবিবেচনাপ্রসূত বা যত অমানবিকই হোক। তাঁরা লিখেছিলেন, ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণেতর রমণীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং যদি তাকে দণ্ড দিতেই হয়, তবে তাকে একটা সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই হবে। কিন্তু অব্রাহ্মণ কেউ যদি ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে তা গর্হিত কর্ম বলে ধরতে হবে এবং তার অপরাধ হবে ক্ষমার অযোগ্য। তাকে দিতে হবে গুরুদণ্ড। স্মার্ত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের এই বিধান।

পাঠান যুগে কায়স্থ সমাজের অনেক ভূস্বামী, জমিদার হয়ে উঠেছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিল। সেকালে এই প্রতিপত্তির ঘোষণা হতো মন্দির প্রতিষ্ঠায়, বাড়িতে নানা পূজা-পার্বণের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে। স্মার্ত রঘুনন্দন বিধান তৈরি করে দিলেন যে বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া সকলেই শূদ্র। কায়স্থরাও শূদ্র। শূদ্রের পক্ষে বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রচর্চা, ধর্মনেতা হওয়া নিষিদ্ধ। কায়স্থ ভূস্বামীরা মন্দির গড়ে বিগ্রহ স্থাপন করে জাঁকজমক করে সমাজে বাহবা নেবে, সে-সুযোগও বন্ধ করে দেওয়া হলো এই নির্দেশ দিয়ে যে, ব্রাহ্মণ কোনও শূদ্রের বাড়ি পুজো করবে না এবং কোনও শূদ্রের দান গ্রহণ করবে না। ব্রাহ্মণের সেবা করা ছাড়া শূদ্রের আর কোনও ভূমিকা নেই। নারী সমাজকে ফেলে দেওয়া হলো শূদ্রের পর্যায়ে, বিধিনিষেধের মধ্যে। কায়স্থ শূদ্র হয়ে যাওয়ায়, মন্দির গড়ে বিগ্রহ স্থাপন ও পূজার্চনায় পুরোহিত পাবে না আর।

আশ্চর্য কথা, সমগ্র সমাজ বিনা প্রতিবাদে নতশিরে এই অপমানকর নির্দেশ মান্য করে নিয়েছে। তাই রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করে আর পুরোহিত পান না। শেষে এগিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দাদা। কিন্তু সেখানেও মন্দির উৎসর্গ করে দিতে হলো তাঁর নামে।

রঘুনন্দনের কালে, তাঁর নির্দেশের ফলে যখন সমস্ত অব্রাহ্মণ সমাজ নতশির, বিপন্ন, অসহায়, তখনই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব। প্রতিবাদী ভূমিকায়।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ শূদ্রের দান গ্রহণ করবেন না। তাদের বাড়িতে পুরোহিতের কাজ করবেন না। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণ সমাজের অর্থাভাব ছিল না। তাঁদের এই অর্থকৌলীন্যের উৎস কি ছিল?
কার দানে তাঁদের এত পরিপুষ্টি?

এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের অর্থকৌলীন্য-জাত জীবনযাপনের একটি বিবরণ মেলে বৃন্দাবন দাসঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে':

ধর্মকর্ম লোকে সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত গায় জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥

গৌরাঙ্গদেব শুরু করলেন ভক্তিবাদী আন্দোলন। নবদ্বীপের সর্বসাধারণকে বললেন :

দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সঙে হাতে তালি দিয়া॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥

(বৃন্দাবন দাসঠাকুর : শ্রীচৈতন্যভাগবত)।

দেবদেবী নিয়ে মাতামাতি নয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কৃপাপ্রার্থী হওয়া নয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনাও নয়। তোমার ঈশ্বরকে তুমি নিজে প্রাণ ভরে ডাকো, ঘরে বসে। দেবালয়ে যেতে হবে না। কারও অনুগ্রহ প্রার্থনাও করতে হবে না।

স্মার্ত ব্রাহ্মণদের প্রতি এ তো একটা চ্যালেঞ্জ। আরও আছে। শূদ্র এবং নারীর ধর্মীয় এবং অনেক সামাজিক অধিকার খর্ব করেছে স্মৃতিশাস্ত্র। তারা ব্রাহ্মণের দীন সেবকে পরিণত। গৌরাঙ্গদেব আর অদ্বৈত আচার্যর মধ্যে তাই কথা হলো :

অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার বাদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা॥ (ঐ)।

এই কথোপকথনের ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের জীবনযাপন ধারার বিপরীত মতিগতি নিয়েই গৌরাঙ্গের দিন কাটছে তখন। নবদ্বীপের শূদ্রসমাজের পল্লীতে যাতায়াত করছেন তিনি। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন। নানা গ্রাম-সম্পর্ক স্থাপন করছেন। এবং তাদের প্রিয় হয়ে উঠছেন।

নবদ্বীপে তখন বৈশ্যরা ছিল বৌদ্ধ। নবশাক-সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণী। তাঁতি তিলি তাম্বুলি গোয়ালা ইত্যাদি হিন্দু হলেও ব্রাহ্মণসমাজের কাছে ছিল

২

অবহেলিত, ফলে তারা বৌদ্ধ বৈশ্যদের সঙ্গেই মেলামেশা করত। এবং তাদের ধর্মকর্ম দ্বারাই প্রভাবিত ছিল।

গৌরাঙ্গের সংস্পর্শে এসে, নতুন সাম্যবাদী ধর্মমত শুনে এবং দলবদ্ধ হয়ে, সর্বসম্প্রদায় মিলে কীর্তনের সুযোগ পেয়ে নবশাক-সমাজ বৌদ্ধদের ত্যাগ করে গৌরাঙ্গভক্ত হয়ে উঠল।

গৌরাঙ্গের এই ভূমিকা হিন্দুসমাজকে সুসংহত করারই ভূমিকা। তিনি এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে নতুন, মানবিক, উদারতাপূর্ণ একটি সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই অনুমিত হয়।

এখন অবশ্য বলা হচ্ছে, গৌরাঙ্গের এমন কোনো স্বপ্ন বা বাসনা যে ছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই। তিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন না। জাতিভেদ নিয়ে কোনো আন্দোলন করেন নি। নিজে ব্রাহ্মণ্য আচার মান্য করে চলেছেন সর্বদা। পতিতোদ্ধার বিষয়েও পণ্ডিত সমাজের ব্যাখ্যা হচ্ছে :

> পতিতদের উদ্ধারকর্তা রূপেই চৈতন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। এখানে 'পতিত' এবং 'উদ্ধার' শব্দ দুটির প্রযৌক্তিক অর্থ আছে। পতিত অর্থ সর্ববর্ণের সর্বজাতির, সর্বাবস্থার অবৈষ্ণব। উদ্ধার অর্থ, তাকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাদান। এই প্রযৌক্তিক অর্থে চৈতন্য আন্দোলন ছিল একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। স্পষ্টভাবে চৈতন্য এবং তাঁর সমর্থকগণ সমাজ সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেন নি। কিন্তু অনুদার ধর্মদ্বারা যে সমাজ আবদ্ধ ছিল বৈষ্ণবীয় উদারতার সঞ্চারে তাতে প্রগতির লক্ষণ ফুটে ওঠে।*

স্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা গৌরাঙ্গদেব সমাজসংস্কার আন্দোলন করেন নি। বৈষ্ণব-আন্দোলনের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল সামাজিক অবস্থান্তরের আয়োজন। তাই ভক্তিবাদের প্রচার সমাজসংস্কারের ইঙ্গিতবাহী হয়ে জনমনকে আশান্বিত করে তুলেছিল।

'চণ্ডালো'পি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ'—মতবাদ নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণের অচলায়তন অধিকারের বিরোধিতা বা তার প্রতি অস্বীকৃতি ঘোষণা।

গৌরাঙ্গদেব ঘরে বসে গুরু মহান্ত সেজে লোকের কানে মন্ত্র দিয়ে বৈষ্ণব-

আন্দোলন বা পতিতোদ্ধার কর্ম সম্পাদন করেন নি। তিনি জনসংযোগ করেছিলেন, মানুষের দরজায় গিয়ে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—এসো, একসাথে ঈশ্বরের নামগান করি।

যেভাবে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন, নবদ্বীপে থাকতে পারলে তাঁর এই আন্দোলন কোন পথে মোড় নিত অর্থাৎ সমাজসংস্কার-আন্দোলনের রূপ নিত কিনা, তা কে বলতে পারে। তার সম্ভাবনার আভাস যে একেবারে মেলে না, তা নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীচৈতন্য হয়ে পুরীতে অবস্থান করছেন। বঙ্গদেশে নিত্যানন্দ তাঁরই নির্দেশে বৈষ্ণব-আন্দোলন চালাচ্ছেন। নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক-প্রধান উদ্ধারণ দত্তকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করে তাঁর বাড়িতে থাকছেন, তাঁর হাতে খাচ্ছেন। সুবর্ণবণিক-সমাজ ব্রাহ্মণের কাছে জল-অচল সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ সেখানে অবস্থান করছেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের কাছে এসব কর্ম তো ঘোর অনাচার। অতএব নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ, যিনি চৈতন্যের সহপাঠী ছিলেন, পুরীতে ছুটে গেলেন। এবং নিত্যানন্দের এই অনাচার-কথা চৈতন্যের কানে তুললেন। ব্রাহ্মণ আশা করেছিলেন যে চৈতন্য রাগ করবেন। বিরূপ হয়ে উঠবেন নিত্যানন্দের প্রতি। এবং তাঁকে শাসন করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের সে-আশা পূর্ণ হলো না। শ্রীচৈতন্য শান্তভাবে জানালেন—নিত্যানন্দ সিদ্ধপুরুষ। সে যা করে তাতে দোষ হয় না। শ্রীচৈতন্যের এই মনোভাবকে লঘু করে দেখার ব্যাপার নয়। নিত্যানন্দকে ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য তিনিই নিয়োগ করেছেন। এখন নিত্যানন্দের কার্যকলাপকে সমর্থন করলেন, সুকৌশলে। এটা তাঁর মানসিক প্রবণতারই প্রকাশ। 'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাই'-এর বাস্তব প্রয়োগ। যাকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্য করা হলো, সে তখনও থেকে গেলো অস্পৃশ্য? তাহলে দীক্ষা আর মন্ত্রের কোন শক্তি এবং সার্থকতা? যে-মন্ত্র অপবিত্রকে পবিত্র করতে পারে না, যে-গুরু শিষ্যকে উদ্ধার করতে পারে না, তার কোন মূল্য?

শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে নবদ্বীপে থাকা সম্ভব হলো না। তিনি সমাজসংস্কার আন্দোলন না করে, নিছক নিরীহ ভক্তিবাদী যে আধ্যাত্মিক প্রচার শুরু করেন, তাতেই নবদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাজ বিচলিত হয়ে তাঁকে চরম আঘাত হানতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন। অবশ্যই সেদিনের সংঘাতটা খুব সহজ আকারের ছিল না। ব্রাহ্মণসমাজ চেয়েছিল কাজীকে কাজে লাগিয়ে কার্যোদ্ধার করতে। কাজীর ভয়ে গৌরাঙ্গের কীর্তন প্রচার দমিত হয়ে যাবে। সাধারণ নবদ্বীপবাসী আর মাতামাতি

করবে না কীর্তন নিয়ে। কিন্তু গৌরাঙ্গের সাহস এবং সংগঠন-শক্তি কাজীকে দমন করতে সমর্থ হলো। বিপন্ন ব্রাহ্মণসমাজ তখন ছাত্রসমবায় গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। কারণ সংগঠনের জোরে গৌরাঙ্গ কাজীকে দমন করতে পেরেছেন, এবার ছাত্রসমবায় গৌরাঙ্গকে আঘাত হানবে। সেদিন তা যদি হতো, অর্থাৎ গৌরাঙ্গের ওপর যদি আঘাত আসত, তাহলে তাঁর সংগঠিত বিপুল শক্তি অবশ্যই ব্রাহ্মণ-সমাজের ওপর প্রত্যাঘাত হানত বলেই মনে হয়। এবং তা এক ভয়াবহ দাঙ্গার রূপ নিত। আর তখনই অপমানিত কাজী প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগে গৌরাঙ্গের ভক্তি-আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দিত সহজেই। কে জানে ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রের পিছনে এমন পরিকল্পনা ছিল কিনা।

কিন্তু গৌরাঙ্গের বুদ্ধিমত্তায় সে-সম্ভাবনার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। বস্তুত তিনি গৃহত্যাগে বাধ্য হলেন। বলা যায়, তাঁকে বিতাড়িত করা হলো নবদ্বীপ থেকে।

জয় হলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের। পরাজয় ঘটল গৌরাঙ্গের ভক্তি-আন্দোলনের। যার মূল কথা ছিল :

ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাই ॥

(বৃন্দাবন দাসঠাকুর : শ্রীচৈতন্যভাগবত)।

সংস্কৃতবিশারদ সুপণ্ডিত মুরারি গুপ্তকে গৌরাঙ্গ বলছেন :

শুন শুন ওহে বৈদ্য আমার বচন।
এড় গীতা অধ্যাত্ম চরচা তোর মন ॥
জীবারে বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যদি সাধ থাকে আর ॥
অধ্যাত্ম চরচা তব কর পরিত্যাগ।
শুণ সংকীর্তন কর কৃষ্ণ অনুরাগ ॥

(লোচনদাস : চৈতন্যমঙ্গল)।

অদ্বৈত আচার্য জ্ঞানবাদের পক্ষপাতী হয়ে উঠছেন শুনে যে নিমাই পণ্ডিত শান্তি-পুর ছুটে গিয়ে বৃদ্ধ আচার্যকে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের সামনে মারধর অবধি করতে দ্বিধা করেন নি, তাঁকেই নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হলো। জ্ঞানবাদী আচারসর্বস্ব পণ্ডিতরাই নবদ্বীপবাসী হয়ে থাকলেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণব-আন্দোলনের বড় পরাজয় এই জন্য যে দলের প্রাণপুরুষ

গৌরাঙ্গদেবই চলে গেলেন। আন্দোলনের ভরাডুবি হয়ে গেলো। বঙ্গজনসমাজ তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলো।

এরপর দেখা যাচ্ছে, সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সুদূর পুরীতে বসে নিরুপায়ভাবে, আক্ষেপের সুরে নিত্যানন্দকে বলছেন—তুমিও যদি মুনি-ধর্ম নিয়ে পুরীতে এসে বসে থাকো, তাহলে আমার প্রতিজ্ঞার কি হবে? আমি যে বলেছিলাম, বাঙলায় নীচ-পতিত-মূর্খদের উদ্ধার করব?

এই উক্তির দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সন্ন্যাস নেবার বাসনা তাঁর ছিল না। স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভক্তিধর্ম প্রচারের মাধ্যমে বঙ্গদেশে একটি সুন্দর সুসংহত সমাজ গড়ে তুলবেন, যেখানে নারী শূদ্র থেকে চণ্ডাল অবধি সকলেই মানুষের ন্যায়সঙ্গত মর্যাদা লাভ করবে। সন্ন্যাস নেওয়ায় তাঁর যেন জলের মাছ ডাঙায় ওঠার অবস্থা। বাইরে সন্ন্যাসীর বেশ, অন্তরে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। শেষে নিজের স্বপ্নকে সার্থক করার দায় তুলে দিচ্ছেন নিত্যানন্দের ওপর। এর চেয়ে বড় পরাজয় বৈষ্ণব-আন্দোলন এবং গৌরাঙ্গের আর কি হতে পারে? গৌরাঙ্গের বিকল্প কি নিত্যানন্দ? তবু গৌরাঙ্গের পরামর্শমতো নিত্যানন্দ বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসংযোগ করেছেন আর গেয়েছেন, 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গর নাম রে।' তবু গৌরাঙ্গ-আন্দোলনের সে-বেগ এবং আবেগ ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-আন্দোলন সুসংগঠিত ছিল না। সময়ও বড় অল্প। মাত্র তেরো মাস (১৫০৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিক পর্যন্ত) গৌরাঙ্গদেব ভাবপ্রকাশ করেছিলেন। তার-পরই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ, সহসা। পরিকরগণ এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আন্দোলন ছিল ভাবপ্রধান। ফলে আন্দোলন ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় এবং পরিকরদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত থাকায় সহজেই তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বৈষ্ণব-আন্দোলন বহু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

অদ্বৈত আচার্য তখন বৃদ্ধ। তাঁর পক্ষে ভক্তিপ্রচার আর সম্ভব ছিল না। তাঁর শিষ্য ঈশান নাগর আর দুই শিষ্য কৃষ্ণদাস এবং শ্যামাদাস আচার্য, অদ্বৈতর স্ত্রী সীতা দেবী, পুত্র অচ্যুতানন্দ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে লাগলেন, এবং সম্প্রদায় গড়ে তুললেন।

অদ্বৈত আচার্য বিদ্রোহী পুরুষ। বৈষ্ণবতার কারণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের

সঙ্গে তাঁর বিরোধ বরাবর। শান্তিপুরে বসে সামাজিক কাজের সময় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উপস্থিতিতে তিনি হরিদাসকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে তিনি পাষণ্ডী বলতেন। তাদের সর্বনাশ কামনা করতেন। ফলে শান্তিপুরের ব্রাহ্মণসমাজও তাঁকে পরিহার করে চলত। শান্তিপুরে তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন সামাজিক দিক থেকে।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র এই বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্গে আপস করে। অর্থাৎ অদ্বৈতর বিদ্রোহী ভূমিকা থেকে সরে এসে ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ফলে আচার্যপন্থী গোস্বামীরা রক্ষণশীল হয়ে পড়লেন।

নিত্যানন্দপন্থীরা খড়দহে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুললেন। তাঁরা অবশ্য তখন উদারপন্থীই ছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্রসমূহ বঙ্গদেশে প্রচলিত হওয়ার পূর্বে মোটামুটি যে-সব সম্প্রদায় এবং উপাসনা-পদ্ধতি ছিল, তা হচ্ছে :

> "(ক) চৈতন্যপুজা।
>
> (খ) অদ্বৈত আচার্যর শ্যালক শান্তিপুর বর্ধমানের কোন কোন গ্রামে, মালদহের কোন কোন গ্রামে, তেওড়া প্রভৃতি স্থানে এবং শ্রীহট্টর 'লাউড়' নামক স্থানে সক্রিয় ছিলেন।
>
> (গ) নিত্যানন্দ মতবাদে বিশ্বাসী বৈষ্ণবগণ বাংলা দেশে প্রায় সবত্র সখাভাব এবং দাস্যভাব প্রচার করেছিলেন। বিশেষ করে দ্বাদশ গোপাল মধ্য রাঢ় অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিলেন।
>
> (ঘ) বর্ধমানের কাছে শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন গৌর নাগরবাদ প্রচার করেন।
>
> (ঙ) গদাধর পণ্ডিতের গদাই গৌরাঙ্গ সম্প্রদায় নবদ্বীপে, বীরভূমে এবং ঢাকার বিক্রমপুরে স্থানীয় ভিত্তিতে জনপ্রিয় ছিল।
>
> (চ) এই সব চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব ছাড়াও বহু সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল। অদ্বৈত আচার্যর শিষ্যদের মধ্যেও স্বাধীন ভাবে সম্প্রদায় গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।"*

এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ চলতই। এ ছাড়াও উপদল ছিল। গৌর

*রমাকান্ত চক্রবর্তী : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক-সম্প্রদায়, শ্রীবাস পণ্ডিতের শিষ্য-সম্প্রদায়, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের 'রসরাজ'-সম্প্রদায়।

বৈষ্ণব-আন্দোলনকারী গৌরাঙ্গ-পরিকরদের ঐক্য আর থাকল না। বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রধান কারণ উপাসনা-পদ্ধতির অমিল। ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রশ্নও ছিল। এই সঙ্গে অর্থ নৈতিক দিকটাও বিবেচ্য। অর্থ নৈতিক কারণে দল-উপদল তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষভাবে।

বৈষ্ণব-আন্দোলন হোম-যজ্ঞ-পুজো-পুরোহিতপ্রথা বাতিল করেছিল। কিন্তু তার স্থলে প্রবর্তিত হলো গুরুবাদ। গুরু ছাড়া দীক্ষা নেই, মুক্তি নেই। ঘরে বসে হাতে তালি দিয়ে নামগান করলেই মুক্তি মিলবে না আর। পথপ্রদর্শক গুরু চাই। গুরু ঈশ্বরতুল্য। পুরোহিতের দক্ষিণা দেওয়ার মতো গুরুকে প্রণামী দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। নইলে গুরুই বা জীবন ধারণ করবেন কিভাবে? শিষ্যের বাড়িতে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অনুষ্ঠানের সময় গুরুবরণ গুরুপ্রণামী বাঁধা। শিষ্যের সামর্থ্যা-নুযায়ী গুরুপ্রণামী। সেটা পাঁচ সিকা থেকে একটি জমিদারি অবধি হতে পারে প্রাপ্তি।

তাহলে যিনি যত শিষ্য করতে পারবেন, তাঁর তত আর্থিক নিশ্চয়তা বাড়বে, সাংসারিক দুর্ভাবনা কমবে। প্রধান গুরুর অধীনে সহকারী গুরু হিসাবে কাজ করলে মূল গুরুকে প্রণামীর সিংহভাগ দিতে হয়। স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে গুরুগিরি করতে পারলে আর কাউকে ভাগ দিতে হয় না।

তাই দল ভেঙে উপদল। এক থেকে বহু।

শ্রীবাসের দারিদ্র্য দেখে শ্রীচৈতন্য চিন্তিত হয়েছিলেন একদিন। চৈতন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, ঘরে বসে না থেকে উপার্জনের চেষ্টা করবে। শ্রীবাস হরিনাম জপ ছেড়ে অন্য কাজ করতে সম্মত হন নি। হাতে তিন তালি দিয়ে বলেছিলেন, তিন দিন যদি কিছু না জোটে, যদি উপবাসে থাকি, তাহলে চতুর্থ দিনে গঙ্গায় ডুবে জীবন বিসর্জন দেবো। চৈতন্য শুনে চমকে উঠে বলেছিলেন—শ্রীবাস, তোমার অন্নাভাব থাকবে না। তুমি দারিদ্র্যমুক্ত হবে। দেখা যায়, শ্রীবাসের দারিদ্র্য ঘুচেছিল। তিনিও একটি শিষ্য-সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

নিত্যানন্দ তো উদ্ধারণ দত্তের মতো সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠী সুবর্ণ-বণিকদের শিষ্য করতে পেরে বিত্তশালী হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বীরভদ্র বিপুল ধনের অধিকারী হয়ে রাজার মতন জীবনযাপন করতেন। তা সম্ভব হয়েছিল গুরুগিরির কারণেই। গুরুগিরি লোভনীয় ব্যবসা হয়ে উঠেছিল। জমিদারের প্রজার মতো শিষ্য হয়ে

দাঁড়িয়েছিল গুরুর সম্পদ। তাই এত দল-উপদলেরও সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁরা চৈতন্য-আন্দোলনের সঙ্গে সামান্যভাবেও যুক্ত ছিলেন, তাঁরা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরা গুরু গোস্বামী হয়ে শিষ্য সংগ্রহে লেগে পড়লেন।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাজ কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে বসে বসে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছিলেন। বৈষ্ণব-আন্দোলন ব্রাহ্মণসমাজের সামনে গুপ্তধনের নতুন দুয়ার খুলে দিলো।

চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দের জীবলীলা শেষ হলো। বাঙলার বৈষ্ণব-আন্দোলনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত। তাঁরা কেউ বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব বা বিধিবিধান রচনা করে যান নি। তাঁরা শুধুই নাম-মন্ত্র প্রচারক।

পরবর্তী নায়কর়া এসবের অভাব বোধ করতে থাকলেন। তাঁরা চান এলোমেলো অবস্থা গুছিয়ে তুলে বাঙলার বৈষ্ণব-আন্দোলনকে সুসংহত রূপ দিতে। তা করতে হলে চাই একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা দর্শন। আবেগসর্বস্বতা স্থায়িত্বের ভিত্তি নয়।

নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। প্রয়োজন বোধ করতেন না। বাঙলার এই আন্দোলনের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামী সমাজেরও প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ ছিল না।

এখন অর্থাৎ বাঙলার পরবর্তী বৈষ্ণব নেতারা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে যাতায়াত শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী, উদ্ধারণ দত্ত, গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ, নরোত্তম দত্ত, রামচন্দ্র (বাঘনা পাড়া), নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রভৃতি।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এঁদের অভাব মোচন করেছিলেন। বৃন্দাবনে তখন বিশিষ্ট ছ'জন গোস্বামী ছিলেন। তাই এঁদের ষড়্‌গোস্বামী বলা হয়। এঁরা হচ্ছেন, রূপ ও সনাতন—দুই ভাই। এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী এবং গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস। রঘুনাথ দাস ছাড়া বাকি পাঁচ জনই ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতবিশারদ সুপণ্ডিত। কিন্তু এই পাঁচ জনই অবাঙালী। দক্ষিণ ভারতীয় কট্টর ব্রাহ্মণ। রূপ, সনাতন এবং জীব গোস্বামী বাঙলা দেশে ছিলেন। রূপ ও সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী। অভিজাত আমলা। এঁরা বোধহয় বাঙলা ভাষাও জানতেন না। বাঙলার জনজীবনের সামাজিক সমস্যা বিষয়ে জানার প্রশ্নই ওঠে না। এঁরা বৃন্দাবনে যাবার পর থেকে আর বাঙলাদেশে আসেন নি। গোপাল

ভট্ট আর রঘুনাথ ভট্ট তো বাঙলার মুখই দেখেন নি। তাঁরাই বাঙলার বৈষ্ণব-সমাজের জন্য ধর্মতত্ত্ব-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের মানসিকতা, প্রবণতা, সংস্কার আরোপিত হলো বাঙলার বৈষ্ণবসমাজের ওপর। বাঙলার জনসমাজের প্রয়োজন থেকে তা গড়ে উঠল না। চৈতন্যভাগবতে লেখা হয়েছে :

গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড ঘুরি কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দে বৃথা যাইবারে নাশ॥ (চৈ. ভা. ২/৬)।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে লক্ষ্য করে এ কথা লেখা হয়েছিল। এখন বাঙলার বৈষ্ণবসমাজের জন্যও অনুরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অতিসূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারযোগ্য গ্রন্থসমূহ নির্ধারিত হলো। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্ট গোস্বামী বাঙলার বৈষ্ণবসমাজের জন্য লিখে দিলেন ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র-প্রভাবিত বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র বা সদাচার-গ্রন্থ—'হরিভক্তিবিলাস।' বৈষ্ণবের করণীয় বিষয়ে যাবতীয় বিধিবিধান নির্দেশিত হয়েছে এর ভিতর।

'হরিভক্তিবিলাস'-এর কঠোর অনুশাসন—ব্রহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে হবে। বর্ণাশ্রম মানতে হবে। সনাতন হিন্দুধর্মের আচার-বিচার মানতে হবে। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের মানুষকে দীক্ষা দিতে পারবে। কিন্তু অব্রাহ্মণ, সে যত বড় বৈষ্ণবই হোক, ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদানের অধিকারী হবে না। অনুলোম প্রথায় চলবে। অর্থাৎ সমাজের যে যেখানে আছে, সে সেখানেই থাকবে। বৈষ্ণব হওয়ার সুবাদে তার সামাজিক কোনো অবস্থান্তর ঘটবে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকবে, চণ্ডাল থাকবে চণ্ডাল হয়েই। 'চণ্ডালো'পি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ'—চৈতন্যগোষ্ঠীর এ তত্ত্ব পরিত্যক্ত।

বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার বাদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা॥

অদ্বৈতর এ স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটল। নামগুণ গেয়ে নাচার পরিবর্তে চণ্ডালই পুড়ে মরল। বিদ্যা আর কুলের শাণিত কুঠারাঘাতে অদ্বৈত-চৈতন্যের স্বপ্নের মূলোচ্ছেদ হয়ে গেলো।

'হরিভক্তিবিলাস'-এ উপাসনা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণেরও নির্দেশ আছে। বঙ্গদেশে কেউ সখাভাবে, কেউ দাস্যভাবে, কেউ রাধাভাবে, কেউ গৌরাঙ্গকে নাগর রূপে কল্পনা করে উপাসনা করতেন। বৃন্দাবনী তত্ত্বে নির্দেশিত হলো, মঞ্জরী ভাবের

উপাসনা করতে হবে। মধুর ভাবের সঙ্গে দাস্যভাব মিলিয়ে শ্রীরাধার দাসী বা সখী ভাবে উপাসনা করতে হবে। এরই নাম মঞ্জুরী সাধনা।

বৃন্দাবনী তত্ত্ব তো এল। বাঙলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলি তা গ্রহণ করলে তবে তো। কেউ তো কারও অধীন নয়। সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। এখন তাদের বুঝিয়ে সম্মত করাবার চেষ্টা শুরু হলো। তার প্রধান উদ্যোক্তা বলা যায় জাহ্নবা দেবীকে। তিনিই অগ্রগণ্য বৈষ্ণব নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বোঝাতে লাগলেন। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কয়েকটি বৈষ্ণব-সম্মেলন করা হলো। শেষে রাজশাহীর 'খেতুরি'-তে নরোত্তম দাস (দত্ত) ঠাকুর আয়োজিত সম্মেলনে বৃন্দাবনী তত্ত্ব বাঙলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হলো।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-নেতৃত্বে পরিচালিত যে বৈষ্ণব-আন্দোলন জনমনে উদ্দীপনা এবং আশার সঞ্চার করেছিল, তার ইতি হয়ে গেলো এখানেই। জয় হলো ব্রাহ্মণ্যবাদের।

কিন্তু বাঙলার সকল বৈষ্ণব-প্রধানই যে নির্বিচারে বৃন্দাবনী তত্ত্বের সবকিছু মেনে নিয়েছিলেন, তা নয়। কিছু ছাড় দিয়ে আপস করতে হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। নরোত্তম দাসঠাকুর কায়স্থ। 'হরিভক্তিবিলাস'-এর বিধিমতে তিনি ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদানের অধিকারী নন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁর আয়োজিত খেতুরি সম্মেলনে, সভায় প্রস্তাব এনে তাঁকে ব্রাহ্মণ-তুল্য বলে সর্ব-সম্মতিক্রমে ঘোষণা করা হলো। অর্থাৎ তিনি কায়স্থ হলেও ব্রাহ্মণের গুরু হবার অধিকার লাভ করলেন।

এর দ্বারা বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ কর্তৃক গৃহীত হলো।

আশ্চর্য কথা, নরোত্তম দাসের মতো ব্যক্তি নিজে কায়স্থ থেকে ব্রাহ্মণ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে খুশি হলেন, কিন্তু কায়স্থ-সমাজের কথা ভাবলেন না।

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন চৈতন্য-পার্ষদ। পরম বৈষ্ণব। খেতুরি সম্মেলনের সময় সম্ভবত তিনি জীবিত ছিলেন না। এঁরা গৌর-নাগরবাদী। এই পরিবারও তাঁদের গৌর-নাগরবাদ তত্ত্ব পরিত্যাগ করলেন না। তাঁরাও ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদান করতেন। সে-অধিকার তাঁরা ছাড়লেন না। বস্তুত তাঁরা বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁদের ধনবল, জনবল ও সামাজিক প্রতিপত্তি প্রবল থাকায় কেউ আর ঘাঁটাতে সাহস করেন নি।

মেদিনীপুরে গোপীবল্লভপুর ধারেন্দার বৈষ্ণবগুরু শ্যামানন্দ এবং তাঁর প্রধান

শিষ্য রসিকানন্দ ছিলেন সদ্‌গোপ। তাঁরা নির্বিচারে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই দীক্ষা-দান করে চললেন। মেদিনীপুরের ধনী প্রতাপশালী ভূঁইয়া, জমিদার, এমনকি ক্ষমতাশালী মুসলমান ফৌজদার পদাধিকারী ব্যক্তি অবধি তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণবতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

'হরিভক্তিবিলাস'-এর নির্দেশ সেখানেও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলো না। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাহসের অভাবেই।

ব্রাহ্মণ সদ্‌গোপকে গুরু স্বীকার করে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করছেন। সেদিনের বঙ্গদেশে অকল্পনীয় ঘটনা ছাড়া আর কি?

কেবল শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য জয়গোপাল দাস কায়স্থ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিতে চাওয়ায় এবং বৈষ্ণবের জাতিবিচার-নীতির বিরোধিতা করায়, বীরভদ্রের নির্দেশে তাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ থেকে বহিষ্কার করা হলো। আর যে-বীরভদ্র উদার মনোভাব নিয়ে বহু বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করায় রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন, তিনিই হয়ে গেলেন চরম রক্ষণশীল। মেয়ের বিয়ে দিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ খুঁজে।

অদ্বৈত আচার্যের পরিবার আগেই রক্ষণশীলতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এখন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগুরু মাত্রেই হয়ে উঠলেন নিজের ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে সচেতন। তাঁদের প্রথম পরিচয় ব্রাহ্মণ। তারপর বৈষ্ণব। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কুলীন-সন্ধানী। সে কুলীন পরিবার শাক্ত, শৈব, ঘোর বৈষ্ণব-বিরোধী—যাই হোক।

এই আচরণ প্রমাণ করে, ব্রাহ্মণ-সংস্কার বা জাত্যাভিমান তাঁদের মনে ছিলই। তাঁরা বৈষ্ণবতায় আটকা পড়েছিলেন। এখানে গুরু-মহান্ত, গোস্বামী হবার সুযোগ মিলছে। ধনে জনে বলীয়ান হয়ে সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া যাচ্ছে—অন্য এক সুখ-সৌভাগ্য মিলছে। তাই একে মেনে নেওয়া।

'হরিভক্তিবিলাস' ব্রাহ্মণত্বকে নিরাপত্তা দান করল। এঁরা এবার স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকলেন। এঁরাই 'হরিভক্তিবিলাস'-অনুসারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। এঁদের দৃষ্টিতে বঙ্গদেশের অন্য যাবতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অনাচারী, ভ্রষ্ট, অশ্রদ্ধেয়, অবৈষ্ণব।

॥ চার ॥

বলা হয়ে থাকে, শ্রীচৈতন্য সমাজসংস্কার আন্দোলন করেন নি। ধর্ম-আন্দোলনও নয়। শুধু ভক্তি প্রচার করতে চেয়েছিলেন। সেটাই বা করতে গেলেন কেন? ভক্ত হয়ে ঘরে বসে ঈশ্বরের সঙ্গে লীলা করলেই তো পারতেন।

পতিতোদ্ধারের বাসনা সমাজ-চিন্তারই প্রতিফলন। তিনি আবার উদ্ধার করতে চাইলেন নারী, শূদ্র, নীচ অধম দরিদ্র মূর্খ থেকে চণ্ডাল অবধি। পতিতোদ্ধারের যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক, নারী, শূদ্র, নীচ, চণ্ডাল—এই নির্দিষ্ট শব্দগুলি সর্বস্তরের অবৈষ্ণবকে বোঝায় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ—যাঁদের পাষণ্ডী বলা হচ্ছে, উদ্ধারের তালিকায় তাঁদের নাম নেই কেন? অবৈষ্ণব হিসাবে তাঁদের নাম আগে থাকা উচিত ছিল। এবং প্রথম সেখান থেকেই পতিতোদ্ধার-কর্ম শুরু করা প্রশস্ত ছিল। ধর্ম ও দর্শন-চর্চার ও ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের অধিকার তখন ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা মানলেই সমাজমান্য হয়ে যেত। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে দিয়ে ভক্তিবাদ মান্য করাতে পারলেই গৌরাঙ্গদেব বড় গুরু মহান্ত হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু সে-পথে না গিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের দ্বারস্থ হলেন কেন?

তথাগত বুদ্ধের কথা মনে পড়ে। রাজপুত্র রাজা হয়ে মহারাজা হবার চেষ্টা না করে রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে এসে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। গৌরাঙ্গদেবের উত্থানও সেভাবেই। শেষ রক্ষা হয় নি। তাই নানা বিরুদ্ধ ব্যাখ্যায় তাঁর মূল প্রবণতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

চৈতন্য-কথা ভাবতে গেলেই তৎকালীন সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা এসে যায়। চৈতন্যের কার্যাবলী নিছক আধ্যাত্মিক ভক্তিপ্রচার হলে সমাজে এত আলোড়ন, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা জাগত না।

তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে "…অনুদার ধর্ম দ্বারা যে-সমাজ আবদ্ধ ছিল, বৈষ্ণবীয় উদারতার সঞ্চারে তাতে প্রগতির লক্ষণ ফুটে ওঠে।"

এ সম্পর্কে বোধহয় বলা যায়, বৈষ্ণবীয় উদারতা গৌরাঙ্গদেবকে আকৃষ্ট করেছিল বলেই তিনি ভক্তিবাদী হয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। সামাজিক প্রগতিই ছিল তাঁর কাম্য। নাহলে ভক্তিপ্রচারে পতিত উদ্ধারের প্রসঙ্গও আসত না। শাক্ত কি শৈব মত-প্রচারকেরা পতিত উদ্ধারের কথা বলেছেন?

পাল রাজত্বের অবসান ঘটল। দক্ষিণ ভারতীয় সেন বংশের রাজত্ব শুরু হলো। এর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস এবং সমাজ-সংগঠন ব্যাপারটা যুক্ত ছিল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। ফলে সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং আধিপত্য ছিল। সেন রাজারা বৌদ্ধ-বিরোধী, ব্রাহ্মণ্যবাদী, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাঁরা এসে বঙ্গদেশে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন, বৌদ্ধ

প্রভাবকে উৎসাদন করে। সে-কাজ গুরুত্ব দিয়ে তৎপরতার সঙ্গেই শুরু করেছিলেন তাঁরা। বল্লাল সেন সে-কারণেই বাঙলার সমাজ-ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সে-কাজের জন্য তিনি কনৌজ থেকে সুপণ্ডিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদের আনিয়েছিলেন। বৌদ্ধ-সংস্পর্শে আবিলতাপ্রাপ্ত সমাজকে সংস্কার করিয়ে হিন্দুসমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল উদ্দেশ্য। বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কুলীন ব্রাহ্মণসমাজ দেশ জুড়ে সে-মহাযজ্ঞ শুরুও করেছিলেন। কিন্তু বল্লালের পর লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালেই সেন রাজত্বকে বিদায় নিতে হলো। এসে গেলো মুসলমান শাসন।

এত অল্প সময়ে অগোছালো সমাজকে গুছিয়ে সুশৃঙ্খল শাসনে আনা সম্ভব হয় নি ব্রাহ্মণদের পক্ষে। রাজ্যহারা, রাজাহারা, বিদেশী ব্রাহ্মণদের তখন আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর পথ ছিল না। এই পরিস্থিতি চৈতন্য আমলেও।

লক্ষণীয়, বাঙলার হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র আছে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য অনুপস্থিত। কান্যকুব্জের আর্যসমাজ-বিন্যাস এখানে নেই। কারণ বঙ্গদেশ আর্যভূমি নয়, এখানে আর্যসমাজ নেই। বাঙলার জনসমাজকে আর্যকরণের চেষ্টা হয়েছে। এখানেও ক্ষত্রিয় ছিল। তারা আর্য নয়। দেশজ ক্ষত্রিয়—হাড়ী ডোম বাগদী বাউরি, 'আগে ডোম বাগে ডোম, ঘোড়ায় ডোম সাজে'—ছড়া তারই ইঙ্গিতবাহী। আর বৈশ্যরা, শ্রেষ্ঠীরা ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাই বল্লালী ব্যবস্থায় যে বর্ণাশ্রম হিন্দুসমাজ গঠিত হয়েছে, সেখানে আছে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। শূদ্রের আবার দু'টি ভাগ—সৎশূদ্র আর অসৎশূদ্র। যাদের জল আচরণীয় তারা সৎশূদ্র। যাদের জল অচল তারা অসৎশূদ্র। তারা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, ঘৃণার পাত্র।

সৎশূদ্র-নবশাক-নবশায়ক—নতুন তৈরি শাখাবৃত্তি-ভিত্তিক—যে যার বৃত্তি নিয়ে এক একটি সম্প্রদায়। অসৎশূদ্র—জল-অচল অর্থাৎ উপেক্ষিত, সমাজ-জীবনে এরা অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়। অতএব সমগ্র সমাজের ঘৃণাই এদের প্রাপ্য। সমাজ-জীবনে 'জল-অচল' শব্দটাই যেন ঘৃণার চরম প্রকাশ, এবং সমাজমান্য। নিজেদের তখন অনেক উঁচু আর বড় পবিত্র বলে মনে হয়। কিন্তু জল-অচল প্রথা হিন্দু বা ব্রাহ্মণের উদ্ভাবিত বা একচেটিয়া নয়। শুনতে অবাক লাগে, এই বঙ্গদেশেই কোনো মানবগোষ্ঠীর কাছে খোদ ব্রাহ্মণরাই জল-অচল সম্প্রদায়। এই বিংশ শতাব্দীতেও। তারা হচ্ছে সাঁওতাল।

> কোন সাঁওতাল অদ্যাবধি কোন ব্রাহ্মণের বাড়িতে খাদ্য গ্রহণকে অপবিত্র কাজ বলে মনে করেন। ব্রহ্মণদের তাঁরা শয়তানের প্রতিভূ বলে মনে করেন। খাদ্য তো দূরের কথা সাঁওতাল সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের

গৃহে জল পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। কুর্মীদের মহিলারা এখনও ব্রাহ্মণের ছোঁওয়া খাবার খান না।

(ডঃ বিনয় কুমার মাহাত : লোকায়ত ঝাড়খণ্ড)।

সাঁওতাল সমাজ আজও শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসাবে টিকে আছে বলেই তাঁদের এই মানসিকতা জানা সম্ভব হয়েছে। তুচ্ছ করার কারণ নেই। জল-অচল ব্যাপারটার একটা তাৎপর্য বোধহয় মিলছে। কারও কাছে কেউ জল-অচল হলেই সে সর্বজনস্বীকৃত ঘৃণ্য অস্পৃশ্য অন্ত্যজ হয়ে যায় না। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বৈরিতাই জল-অচল ঘোষণার উৎস। স্বার্থের সংঘাত এনেছে অবিশ্বাস-ঘৃণা-বৈরিতা। তা থেকেই সম্পর্কহীনতার ঘোষণা—জল-অচল। অর্থাৎ ওরা অনাত্মীয়—অবিশ্বাসী।

বাগদী বাউরি, ডোম, মল্ল—বাঙলার আদিবাসী গোষ্ঠীর শরিক। আর্য অনুপ্রবেশকে এরা বাধা দিয়েছে যথাসাধ্য। স্বাধীনতা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছে। যতকাল পেরেছে, প্রতিহত করেছে বিদেশী শক্তিকে। সৃষ্টি হয়েছে বৈরিতা। হয়তো এদের কাছেও তখন ব্রাহ্মণ হয়ে উঠেছিল জল-অচল সম্প্রদায়। আর্যদের লিখিত সাহিত্য আছে, শাস্ত্র আছে। এদের তা ছিল না। তাই অতীত-কথা ধরা নেই। ছড়ায় গানে লোকগাথায় যদি থেকেও থাকে, কোথায় হারিয়ে গিয়েছে সে-সব। সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় নি। ফলে হিন্দু বৌদ্ধ যুগের, এমনকি চৈতন্যযুগের বাঙলার জনসমাজের স্পষ্ট চিত্রই কি মেলে ? মনে হয়, তখন বাঙলার জনগোষ্ঠীর সবই ছিল হয় হিন্দু, না হয় বৌদ্ধ। প্রকৃতই কি তা ছিল ? বাগদী বাউরি ডোম কি হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিল ?

বাঙলার আদি গোষ্ঠীর সম্মানিত ক্ষত্রিয় বীর যোদ্ধারা শেষ অবধি হিন্দু-সমাজ-প্রান্তে নিরুপায় আশ্রয়প্রার্থী। তাই তারা জল-অচল। অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অসৎশূদ্র, হীন, মূর্খ, দরিদ্র, অন্তেবাসী।

জল-অচল তারাই, উচ্চবর্ণের মানুষের জীবনযাপনে যারা অপরিহার্য নয়। এরা ছাড়াও জল-অচল সম্প্রদায় ছিল।

প্রাক-স্বাধীনতা কালে নদীয়া জেলার গ্রামাঞ্চলেই দেখা যেত, হিন্দুসমাজভুক্ত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছেই অবজ্ঞার পাত্র ছিল যুগী (যোগী), সুবর্ণবণিক আর বৈশ্য। লোকে বলত, ওরা নিচু, ওদের জল খেতে নেই। সুবর্ণবণিকদের প্রতি অবজ্ঞা ছিল প্রবল। সেটা কত দূর তা বোঝা যায় একটি প্রচলিত ধারণা থেকে।

ইলিশ মাছ কাটা হলে, তার কণ্ঠ থেকে সাদা সরু চালের মতো একটা হাড়

বার হতো। সেটা দেখিয়ে বাড়ির ঠাকমা দিদিমা স্তরের প্রবীণা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের বলত—এই ত্থাখ, এটা সোনার বেনের বাড়ির ভাত। মাছটা আগের জন্মে বামুন ছিল। সোনার বেনের বাড়ির ভাত খেয়েছিল। সে-ভাত আর গলা থেকে পেটে নামে নি। মাছ হয়ে জন্মেছে। ভাত গলায় আটকে আছে। মাছের একটা সরু নাড়ী বার করে বলত, এটা বামুনের পৈতে। খা সোনার বেনের বাড়ির ভাত!

ঘৃণা কুৎসা ছড়ানো হয়েছে কত সুকৌশলে। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। সুবর্ণবণিকের বাড়িতে ব্রাহ্মণের ভাত খাওয়া নিয়ে এমন প্রচারের উৎস কি? এবং স্বতঃই যে উত্তর মনে আসে, তা হচ্ছে, উদ্ধারণ দত্তের বাড়িতে নিত্যানন্দের ওঠাবসা এবং অন্নগ্রহণই এই অপপ্রচারের উৎস। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ পুরীতে শ্রীচৈতন্যের কাছে নালিশ জানিয়ে কৃতকার্য না হওয়ায় নিজেদের নীতিকে বজায় রাখতে বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজের সর্বস্তরে এই কুসংস্কারকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এত মাছ থাকতে ইলিশকে সেই অপরাধী ব্রাহ্মণ ধরা হলো কেন? এ বিষয়ে অনুমান করা যেতে পারে যে আর্য ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ এবং বঙ্গদেশে বহিরাগত, তাই সাদা এবং বহিরাগত ইলিশই তার প্রতীক হয়েছে। ইলিশকে খালে-বিলে-পুকুরে পাওয়া যায় না। মূলত সামুদ্রিক মাছ, তাই দেশজ নয়। বহিরাগত এবং বিশিষ্ট। যাই হোক, একেও বলা যাবে বৈরিতার ছোবল। কারণ, বৈশ্য, যুগী আর সুবর্ণ-বণিক, কেউই হিন্দু, হিন্দুসমাজভুক্ত সম্প্রদায় ছিল না। বৈশ্য এবং সুবর্ণবণিক শ্রেষ্ঠীসমাজ ছিল বৌদ্ধ। সে-সমাজে তাঁরা ছিলেন বিশেষ সম্মানিত। এঁদের ওপর ভর দিয়েই বৌদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতির বিজয়-বৈজয়ন্ত উড়েছিল।

বৌদ্ধশক্তির অর্থ নৈতিক কাঠামোর ওপর আঘাত হানতেই এদের প্রতি এত বৈরিভাব পোষণ। যুগীরা তো নাথযোগী সম্প্রদায়ভুক্ত, বর্ণাশ্রম-বিরোধী গোষ্ঠী। শিক্ষায় জ্ঞানে কর্মে এরা ছিলেন উচ্চবর্গীয়। এঁরা কেউই বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থাকে স্বীকার করেন নি। তাই বর্ণাশ্রমী হিন্দুর কাছে এঁরা ছিলেন জল-অচল, অবজ্ঞার পাত্র। চৈতন্যের সময়েও সুবর্ণবণিক আর বৈশ্যরা বৌদ্ধ ছিলেন। উদ্ধারণ দত্ত বৌদ্ধ থেকেই বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তাই আবার বলতে হয়, জল-অচল, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ বলে যে সামাজিক ঘৃণা সমাজচল হয়ে জনমনে দৃঢ়মূল হয়েছে, তা কিন্তু নিতান্তই প্রতিহিংসাজাত।

চৈতন্যের সময় এই সামাজিক সঙ্কট প্রবল ছিল। মীমাংসা হয় নি বহু সামাজিক সমস্যার। ব্রাহ্মণসমাজ কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে আছে। বৌদ্ধসমাজ

ছত্রভঙ্গ। তাদের রাজা নেই। জ্ঞানী পণ্ডিত সমাজ দেশত্যাগী। পলাতক। বিহার সঙ্ঘাবাস পরিত্যক্ত, শূন্য, কোথাও আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত। গৃহস্থ বৌদ্ধরা বিপন্ন। ধর্মত্যাগ সহজ নয়। ধর্মত্যাগ করে হিন্দু হলে তো নিম্নস্তরে, ঘৃণার আসনে বসিয়ে দেবে। তারা দ্বিধান্বিত। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় দিশেহারা। অন্যদিকে মুসলমান ধর্মপ্রচারকেরা সক্রিয়। এই পরিবেশেই গৌরাঙ্গদেব ভক্তিপ্রচারক। সকলকে প্রেম-সুখে ভাসাবেন।

অধ্যাপক বিনয় সরকারের মতে :

> Chaitanya's Vaishnava cult was one of the 'Aryan' rivals to Islam in the matter of making converts from Non-Hindu and Non-Buddhist in medieval Bengal.
>
> (Benoy Kumar Sarkar : *Krishnagar College Centinary Commemoration Volumes.*)।

মনীষী বিনয় সরকার এখানে একটি বিশেষ মত প্রকাশ করেছেন যে সে-সময় বঙ্গদেশের অধিকাংশ হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনোটাই ছিল না। ছিল এদের বাইরে নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে। ইসলাম প্রচারকেরা তাদেরই ধর্মান্তরিত করছিলেন। চৈতন্যের উদ্দেশ্য ছিল তাদের হিন্দুসমাজভুক্ত করা। সেই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব আন্দোলন। তাই তিনি ইসলাম প্রচারকদের প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাহলে বিনয় সরকারও বলছেন, চৈতন্য-আন্দোলন উদ্দেশ্যমূলক ছিল।

চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থে বারংবার উল্লেখিত নীচ শূদ্র অধম পতিত। এগুলি তৎকালীন সমাজচল শব্দ। আদি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের প্রতি ঘৃণার্থে প্রযুক্ত হতো। আর্যরা আগে এদের বলতেন পক্ষী, কাক, পায়রা, অসুর। বঙ্গদেশ বিজয়ের পর তারা হয়েছে অধম, পতিত, নীচ। চৈতন্যের সেই পতিতদের উদ্ধার করার আন্দোলন। এটাই আর্যেতরদের আর্যকরণ-প্রয়াস। সেই সঙ্গে সকলকে নিয়ে সুসংহত সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন।

'হরিভক্তিবিলাস' সে-সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দিলো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে তাই চৈতন্য-অনুসারী না বলে বৃন্দাবনের গোস্বামী-নির্দেশিত সম্প্রদায় বলাই বোধ হয় শ্রেয়।

পাঁচ

'হরিভক্তিবিলাস' ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র-প্রভাবিত। কিন্তু বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ। তাই ভিন্নতা এসেছে। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেই শূদ্র। শূদ্রের অধিকার নেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার। শূদ্র হচ্ছে ব্রাহ্মণের সেবক মাত্র। নারীরও সেই ভূমিকা। বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থে সে-কঠোরতা নেই। এখানেও নির্দেশ হচ্ছে, বর্ণাশ্রম মানতে হবে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে হবে। শূদ্র শূদ্রই থাকবে। কিন্তু শূদ্র এবং নারী এখানে ব্রাহ্মণের সেবকমাত্র নয়। তারাও ধর্মচর্চা, শাস্ত্রচর্চা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার অধিকারী। বৈষ্ণবতায় পুরোহিত নেই, গুরু আছে। এখানে ব্রাহ্মণ যেমন মন্ত্র-দীক্ষাদাতা গুরু হতে পারবে, তেমনি শূদ্র এবং নারীও গুরু হবার অধিকারী।

বাঙলায় বৈষ্ণব-আন্দোলনের ফলেই ব্রাহ্মণের ধর্মীয় একাধিপত্যে চিড় খেলো। তাই এই আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, নিছক ভক্তিপ্রচার উদ্দেশ্যে—এ কথার গুরুত্ব হ্রাস পায়।

এই অধিকার লাভের ফলে বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেও অদ্বৈত-পত্নী সীতা দেবী এবং নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী বৈষ্ণবগুরু হয়ে শিষ্য-পরিবৃতা হলেন! মজার কথা এই যে তাঁরা আবার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজভুক্তও থাকলেন। ফলে বৈষ্ণব-আন্দোলনের গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য কমলো। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বৈষ্ণবতা হয়ে দাঁড়াল সুযোগ লাভের হাতিয়ার। তবু এই আন্দোলন সেদিন হয়ে উঠেছিল সামাজিক মুক্তিযজ্ঞ।

শূদ্র পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়ায় কায়স্থরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই পাঠান যুগে দেখা যায় কায়স্থ ভূস্বামীরা অধিকাংশই বৈষ্ণব। মেদিনীপুরে শ্যামানন্দের আন্দোলনের সময় ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের কায়স্থরা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হলে গৌরব বোধ করেন। শূদ্রতা থেকে মুক্তি মিলল বলে। ধর্মচর্চায় আর বাধা থাকল না। এই বাধার সম্মুখীন স্বামী বিবেকানন্দকেও হতে হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে, ধর্মসভায়। প্রশ্ন উঠেছিল, শূদ্রের অধিকার কোথায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার? বিবেকানন্দকে বলতে হয়েছিল যে তিনি কায়স্থ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। বাঙলার বৈষ্ণব কায়স্থরা ধর্মীয় গুরুর অধিকার পেয়েছেন অনেক আগেই। অবমানিতের জীবন থেকে মুক্তি চায় সকলেই। বৈষ্ণবতায় এসে ধর্মচর্চা বা ধর্মীয় গুরু হবার অধিকার মিলল। কিন্তু বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা যে ভেদচিহ্ন হয়ে থাকল? মেদিনীপুরের শ্যামানন্দী বৈষ্ণবরা তাই দাবি জানাতে থাকলেন ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য।

শ্যামানন্দী বৈষ্ণবরা এই তত্ত্ব প্রচার করতে থাকলেন যে, বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে পার্থক্য বিচার করা যায় না। এই তত্ত্ব সম্পর্কে উনিশ শতকের কলকাতাতেও বিচার হয়েছে এবং পরে তা নিয়ে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দলাদলি শুরু হয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সমতার তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার ফলে বৈষ্ণবত্বের মধ্যে সংস্কার সহ ব্রাহ্মণত্বের সংক্রাম অনিবার্য হয়ে উঠল। ফলতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অত্যন্ত রক্ষণশীল হয়ে পড়লেন।*

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন না অনেক বৈষ্ণবগুরু। অনেকে দলে ঢুকেও দল থেকে বেরিয়ে এলেন, মতভেদের কারণে। 'হরিভক্তিবিলাস'কে অনুসরণ করতে অনীহা। অন্য কারণও অনেকে দেখিয়েছেন। সেটা অর্থ নৈতিক। গুরুগিরি তখন অর্থকরী লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত। যে কেউ বৈষ্ণবগুরু হতে পারে। ফলে গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র বৈষ্ণবগুরুর উদ্ভব ঘটল। স্ব স্ব প্রধান।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগুরুরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়তে চেয়েছিলেন। ফল বিপরীত হয়ে গেলো। সাধারণ মানুষ চৈতন্যাশ্রিত হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। 'হরি' বললেই মুক্তি মিলবে, সামাজিক মানমর্যাদা মিলবে, মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি মিলবে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাতপাত, উচ্চনীচ, অধিকারী-অনধিকারী বিচারে ফিরে গেলো। তারই সুযোগে গড়ে উঠল বৈষ্ণবীয় দল-উপদল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আর নির্বিকার থাকতে পারলেন না। দল-উপদলের সফলতা দেখে তাঁরা বিচলিত। ক্ষিপ্ত ভৎর্সনাকারীতে পরিণত। আঠারো শতকে নবদ্বীপে থাকতেন বৈষ্ণব উপাসক তোতারাম। ইনিও দক্ষিণদেশীয় দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ। তিনি এই সব উপসম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখে সক্ষোভে ঘোষণা করেছিলেন :

আউল বাউল কর্তাভজা নেতা দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখী ভাবকী স্মার্ত জাত গোঁসাই॥
অতিবড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ না করি॥

(শ্রীহরিদাস দাস : গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন)।

'গৌরাঙ্গ-নাগরী'দেরও অচ্ছুৎ বলে ত্যাজ্য করা হয়েছে। অথচ এটি চৈতন্য-পার্ষদ

* রমাকান্ত চক্রবর্তী : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

নরহরি ঠাকুর প্রবর্তিত সম্প্রদায় এবং সমাজমান্য। তোতারামের ধিক্কারে উপ-সম্প্রদায়গুলির কিছু যায় আসে নি। তাদের সংখ্যা কমে নি, বেড়েছে। তা দেখে তোতারাম এবার খেদোক্তি করেছেন :

পূর্ব কালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়।
তিন তেরো বাড়ল এবে ধর্ম রাখা দায়। (ঐ)।

তেরো থেকে উনচল্লিশটি উপসম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে গেলো।

নবদ্বীপে গৌর নিতাই মানুষের দরজায় ঘুরে ভক্তিপ্রচার করেছেন। সর্বস্তরের মানুষকে নিজেদের দলভুক্ত করতে চেয়েছেন। তোতারাম নিজের তথ্‌তে বসে সকলকে বলেছেন—দূর হটো, অনাচারী।

এ প্রসঙ্গে গবেষক অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর মন্তব্য :

> আঠার শতকের মাঝামাঝি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অসহিষ্ণুতা ও ছুৎমার্গ এতটাই প্রবল হয়েছিল এবং সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি এমন জাঁকিয়ে বসেছিল যে আপন ধর্ম সমাজের অন্তর্গত মানুষদেরই তারা অস্পৃশ্য করতে চেয়েছিল মূল ধারা থেকে।
>
> (সুধীর চক্রবর্তী : বলাহাড়ী সম্প্রদায় আর তাদের গান)।

তিনি আরও বলেছেন :

> অবক্ষয়িত ও সংরক্ষণপন্থী মৌল বৈষ্ণব ধর্মের অনুদারতাই গৌণ সম্প্রদায়গুলির উদ্‌ভবের প্রধান কারণ। (ঐ)।

তোতারাম নবদ্বীপে তাঁর সাধনক্ষেত্র গড়েছিলেন। বড় আখড়া তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এই আখড়া স্থাপনের জন্য নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ছ'বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। কোনও বৈষ্ণবকে নদীয়ার রাজা জমি দান করেছেন আখড়া করতে, এ সংবাদ মনে চমক লাগায় এবং সন্দেহ জাগায়। কারণ :

> এই রাজ পরিবার চৈতন্যের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করিতেন।
>
> (দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় : ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত)।

তোতারাম তাহলে চৈতন্যবিমুখ রাধাকৃষ্ণ-উপাসক বৈষ্ণব ছিলেন। তাই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ! একথা বলার কারণ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে নবদ্বীপের চৈতন্যোপাসকরা একবার তাঁদের চৈতন্য-বিগ্রহকে ছ'মাস অবধি মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। মহারাজা গিরীশচন্দ্রের কাল অবধি এ অবস্থা চলেছিল।

> নবদীপের রাজা এবং পণ্ডিতগণ চৈতন্যকে অবতার মধ্যে গণ্য করেন নাই। (ঐ)।

বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে শাক্ত রাস প্রবর্তন করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। অন্যদিকে অদ্ভুত সব ছড়া সৃষ্টি হয়েছে :

নবদ্বীপের বাঁধা ঘাটে
শ্রীচৈতন্য পাঁঠা কাটে
নিতাই ধরেছে দুটি ঠ্যাং
বোল হরি বোল—বাদ্যি বাজে
ড্যাডাং-ড্যাডাং-ড্যাং ॥

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-আন্দোলনের স্বরূপই প্রকাশিত এর ভিতর দিয়ে।

॥ ছয় ॥

তোতারামের উল্লেখিত তেরোটা অচ্ছুৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর জাতগোঁসাই সম্প্রদায় একটি। এটাই জাতবৈষ্ণব সম্প্রদায়। আখড়াধারী বাবাজী এবং তার শিষ্য সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো কবে এবং কিভাবে? অনেকের মতে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বাইরে অজানা বৈষ্ণবরা অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতিসমূহের মধ্যে বাগদী ডোম বাউরিদের বৈষ্ণব করেছিল। তা থেকেই জাতবৈষ্ণব-সমাজের উদ্ভব। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জাতবৈষ্ণব-সমাজ বর্ণাশ্রমী নয়। যে কোনও বর্ণের মানুষ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে জাতবৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ করতে পারে। ত্যাগ করতে হবে তাকে পূর্বাশ্রমের সকল পরিচয়—নাম, পদবি, গোত্র ইত্যাদি। পরিচয় হবে বৈষ্ণব। তার বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হবে জাতবৈষ্ণব-সমাজের মধ্যেই। তারা হবে চৈতন্যোপাসক। তারা হতে পারে গৃহী অথবা সংসারত্যাগী বৈরাগী।

কার বা কাদের নেতৃত্বে এই সমাজের উদ্ভব—আজ তার স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের স্বপ্ন যেমন ছিল বলে আমরা মনে করি, সেই স্বপ্নই যেন রূপ নিয়েছে এখানে। মুসলমান এবং খ্রীস্টান সমাজের বাইরে হিন্দু-সমাজভুক্ত এমন দ্বিতীয় কোনও সম্প্রদায় আছে বলে মনে হয় না। থাকলেও আমার জানা নেই। বর্ণাশ্রম সম্পূর্ণ অস্বীকৃত এবং যে-কেউ এই সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারেন। কিন্তু কবে থেকে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব? সাধারণভাবে বলা হচ্ছে, 'হরিভক্তিবিলাস' বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হবার পর জাতবৈষ্ণব-সমাজের জন্ম। অনুন্নত, অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ জাতে উঠবার জন্য অর্থাৎ সামাজিক অবস্থান্তর ঘটাবার জন্যই চৈতন্যাশ্রয়ী হয়ে পূর্ব পরিচয়কে মুছে দিয়ে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। এদের এই সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে গ্রাম্য মূর্খ বিকৃত রুচির

বাবাজীরা। এই বাবাজীরা ছিল কায়স্থ অথবা জলচল নবশাক সমাজের মানুষ। গুরুগিরি ব্যবসার অর্থকরী লাভের প্রত্যাশায় তারা এ কাজ করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত চেষ্টায় মূর্খ গ্রাম্য বাবাজীরা দেশজুড়ে এত বড় এবং সুশৃঙ্খল একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলল কিভাবে? পরের প্রশ্ন, জাতবৈষ্ণব-সমাজ বঙ্গদেশে 'হরিভক্তি-বিলাস' গৃহীত হবার পর উদ্ভূত—এ কথা কিভাবে বলা যায়? তৃতীয় প্রশ্ন, জাতবৈষ্ণব-সমাজ নিছক অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ নিয়ে গঠিত—তারও কি তথ্যগত নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে? তেমন সমীক্ষা কি হয়েছে?

বীরভদ্র যে বহু নেড়ানেড়ীকে বৈষ্ণব করেছিলেন, তারা কোন সমাজে আশ্রয় নিয়েছিল? শ্যামানন্দ যে মুসলমানদের বৈষ্ণব করেছিলেন, তাঁরা কি হরিদাসের মতো জীবনযাপন করেছিলেন? গৃহী থাকলে কোন সমাজভুক্ত হয়েছিলেন? বহু আদিবাসী এবং হিন্দুসমাজেরও বহুজন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কোন পরিচয়ভুক্ত হয়েছিলেন? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার আগে বৈষ্ণবতার উদার হাওয়াই বয়ে চলেছিল। জাতপাত আর ব্রাহ্মণের দাপট তখনও সে আন্দোলনকে স্পর্শ করে নি। তখন বিপরীত ধারাই চলেছিল। তা চলছিল প্রধানত নিত্যানন্দের নেতৃত্বে। নিত্যানন্দের আচরণ ছিল ভেদনীতি-বিরোধী। জাতবৈষ্ণব সমাজ নিয়ে গ্রাম ও পরিবারভিত্তিক সমীক্ষা না হলে নিশ্চয় করে কোনও কথা বলা অবশ্য সম্ভব নয়, অনুমান ছাড়া গতি নেই।

অভিরাম দাসের বাড়ি ছিল হুগলি জেলায়। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তিনি নিত্যানন্দের সহযোগী হিসাবে ভক্তিপ্রচারে ব্রতী হন। অত্যন্ত প্রতাপশালী প্রচারক। হুগলি বর্ধমান বাঁকুড়া অঞ্চলে তিনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তাঁর স্ত্রীর জাতি-পরিচয় নিয়ে নানা মত প্রচলিত। কারও মতে তিনি মুসলমান-কন্যা। 'ভক্তি রত্নাকার' গ্রন্থ মতে তিনি ব্রাহ্মণ-কন্যা। হুগলি গেজেটিয়ার ১৯৭২ সাল (পৃঃ ২১২) মতে তিনি মালাকার-কন্যা। কোনটি সঠিক? বীরভদ্র যাঁর স্নেহ-ভাজন, শ্রীনিবাস আচার্য যাঁর অনুগত, যিনি চৈতন্য-নির্দেশিত হয়ে নিত্যানন্দের সহযোগী—সেই বিশিষ্ট জন অভিরাম দাসের পত্নীর জাতি-পরিচয় নিয়ে তাহলে সংশয় আছে। ব্রাহ্মণ-কন্যা হলে এমন প্রশ্ন উঠত না। অনুমান হয়, অভিরাম দাস তাহলে জাতিভেদ বর্ণভেদ মানেন নি। ভিন্ন বর্ণের নারীকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ জাতবৈষ্ণব-সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্বের একটি ইঙ্গিত বোধহয় মিলছে এখানে।

১৫০৭ সালে হুগলিতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তখন উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামে অন্নসত্র খুলেছিলেন বিশালাকারে। হাজার হাজার ক্ষুধিত মানুষ সেখানে অন্নগ্রহণ করতে আসত। উদ্ধারণ দত্ত তাদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ধর্মান্তরিত সেই হাজার হাজার মানুষ কি তারপর বর্ণাশ্রমী ছিল, নাকি জাতবৈষ্ণব-সমাজ গড়েছিল?

অনুমিত হয়, নিত্যানন্দ এবং অভিরাম দাসের নেতৃত্বেই জাতবৈষ্ণবসমাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কোনও গ্রাম্য বাবাজীর দ্বারা নয়। অভিরাম দাসের মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, বলা যায় না যে জাতবৈষ্ণব শুধুই নিম্নবর্ণের মানুষ নিয়ে গড়া দল। তাহলে উচ্চবর্ণের প্রবল চাপে তা স্থায়ী হতো না। সামান্য স্বীকৃতিও পেত না। তাদের নিয়ে মাথাবাথা হতো না উচ্চবর্ণের সমাজের।

কিন্তু জাতবৈষ্ণব-সমাজ ক্রমেই সুসংহত হয়েছে। সমগ্র দেশ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে এবং সংখ্যার দিক থেকেও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৮১ সালের আদমসুমারির হিসাব মতো বঙ্গদেশে জাতবৈষ্ণবের সংখ্যা ছিল ৫,৬৮,০৫২ জন। ১৮৭৯ সালের হিসাবে মেদিনীপুরে ছিল ৯৬,১৭৪ জন। বর্ধমানে ছিল ২৬,০০০ জন। হুগলিতে ছিল ১২,১০৭ জন। এদের অনেকেই ধনী, ব্যবসায়ী এবং কৃষিজীবী। এই কয়েক লক্ষ ধর্মান্তরিত বৈষ্ণব মিলে একটি সমাজ গড়ে তুলেছিল। পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল। অবশ্যই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচারে উভয় পক্ষের সমতার প্রশ্ন ছিলই। অন্ত্যজের সঙ্গে উচ্চবর্ণ তখনই সানন্দে মিশে গিয়েছিল— এ কথা বলা যায় না। এখনও তা হয় না। তবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধা ছিল না। কারণ তারা স্বজাতিতে পরিণত। সবাই জাতবৈষ্ণব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এমন কোনও সম্প্রদায় গড়ে নি। গড়তে চায়ও নি। তারা বর্ণাশ্রমী। অন্য বৈষ্ণব দল-উপদল কি এমন কোনও সমাজ গড়েছে? সাধারণভাবে দেখা যায়, যে যার বর্ণে স্থিত থেকে সাধন-ভজনের জন্য মিলিত হয়ে একটা সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে মাত্র। তাই জাতি বর্ণ হিসাবে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব মেলে না। আঠারো শতকে নদীয়া জেলায় উদ্ভব ঘটেছে চারটি গৌণ ধর্ম-সম্প্রদায়ের। কুষ্টিয়ায় লালন ফকির সম্প্রদায়, মেহেরপুরে বলাহাড়ী সম্প্রদায়, চাপড় থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে সাহেবধনী সম্প্রদায় এবং কল্যাণীর কাছে ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়। কর্তাভজা এবং লালন ফকিরের নাম বঙ্গদেশে সুপ্রচারিত।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী গ্রন্থ রচনা করে অন্য দু'টি সম্প্রদায় সম্পর্কে অবহিত করিয়েছেন। এই সম্প্রদায়গুলি সঙ্গীত এবং আচার-বিচারের ভিতর দিয়ে যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, তা অতি মহৎ, উদার এবং মানবিক। এঁরা জাতপাত ভেদাভেদ ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী। মানবপ্রেমী। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত এবং আলোচিত ব্যক্তিত্ব লালনশাহ। জাতপরিচয়-বিরোধী তার গান সুবিখ্যাত। সভা-মঞ্চে, সুধীজনের আলোচনা-সভায় সে-বক্তব্য উদ্ধৃত হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়, মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রশংসিত সেই বক্তব্যের প্রয়োগকর্তা মেলে না। লালন সম্প্রদায়ের ভিতরেই কি তার প্রয়োগ আছে? শোনা যায়, লালন সম্প্রদায়ের দীক্ষাব্যবস্থা আছে। শিষ্য মুসলমান হলে তার দীক্ষা হয় ফকিরী মতে। হিন্দু হলে তার দীক্ষা হয় বৈষ্ণব মতে। অর্থাৎ জাতি এবং তার ভিন্নতা স্বীকৃত। সম্প্রদায় আছে, সমাজ গড়ে ওঠে নি।

বলরামী সম্প্রদায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য উচ্চনীচ মানে না। কিন্তু এরা বর্ণাশ্রমী, এবং জাতিভেদ আছে। হাড়ি ডোম মুচি মাহিষ্য মুসলমান সবরকম শিষ্যই আছে। সকলেই গৃহী এবং নিজের সমাজ-মধ্যেই বাস করে। এদের হিন্দু শিষ্যরা বলরামকে বলে হাড়ী রাম। মুসলমান শিষ্য বলে হাড়ী আল্লা।

সাহেবধনী সম্প্রদায়ও জাতি-সীমায় আবদ্ধ। বাহ্যিক মিলনে উদার। মুসলিম গুরুর হিন্দু শিষ্য। এবং হিন্দু গুরুর মুসলিম শিষ্য আছে। ধর্মীয় উৎসবে পঙ্‌ক্তি ভোজে জাতিবিচার নেই। হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে রাঁধে, পরিবেশন করে এবং ভোজন করে। তারপর যে যার সমাজে ফিরে যায়। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে হিন্দু খোঁজে তার হিন্দু সমাজ, মুসলমান খোঁজে মুসলিম সমাজ। ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হিন্দু খোঁজে তার স্ববর্ণ পরিবারকে, আসে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর তার মন্ত্র, শাস্ত্র। মুসলমান ছোটে মৌলভীর কাছে। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সব তত্ত্ব, আচরণ, গান বহিরঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে। যে-মৌলবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার—তারই দ্বারস্থ হতে হয় শেষ অবধি। এই সংকট প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী তাঁর একটি গ্রন্থে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের একটি পরিবারের কর্তা কামাল হোসেন। তাঁর ছেলে আর মেয়ের ডাকনাম যথাক্রমে গোপাল আর মীরা। তাদের পোশাকী নাম মকবুল হোসেন আর রোকেয়া সুলতানা। এর কারণ কি?

> কারণ ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে হবে যে। সমাজ বলে একটা জিনিশ আছে মানেন? এবারে বলুন, মকবুলকে কোন হিন্দু বাড়ি বিয়ে দেওয়া যাবে? সবাই তো জানেন, আমার ঘরে দীনদয়ালের

আসন। হরিমতী দিদির বাস। সবাই এটা ভালো করেই জানে যে আমি পুরান কুরান কোনটাই অন্তর থেকে মানিনি। তবু কি আপনার ভাইপোর সঙ্গে মীরার বিয়ে দেবেন? দেবেন না। সেই জন্যে আমাকে আলেম সাজতে হয়। সবাইকে বলতে হয় নামাজ পড়। (সুধীর চক্রবর্তী : গভীর নির্জন পথে)।

কর্তাভজা সম্প্রদায়েও হিন্দু মুসলমান অনুগামী আছে। এই সম্প্রদায়েও উচ্চবর্গীয় সমাজের মানুষকে অনুগামী হতে দেখা যায়। কিন্তু এঁরাও অনুগামীদের নিয়ে কোনও সমাজ গড়ে তুলতে পারেন নি। শুধু মেলা আর গানে আবদ্ধ।

জাতবৈষ্ণব-সমাজের এখানেই সফলতা। এসো, মিলিত হও, ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের দায়দায়িত্ব সমাজের। তুমি যে-ই হও, যেখান থেকেই এসে থাকো, এখানে তুমি সম্মানিত সদস্য। এদের এই সফলতাই আক্রান্ত হওয়ার কারণ। প্রধান আক্রমণকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। তাঁরা প্রচার করলেন, জাতবৈষ্ণবরা অস্পৃশ্য। গৃহী বাবাজীরা আধ্যাত্মিক জারজ। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, জাতবৈষ্ণবরা সমাজ-বহির্ভূত। ওরা বৈষ্ণবসমাজে হরিজন। উচ্চবর্ণীয় বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবরা বলেছেন :

> ওরা ব্রাহ্মণদের কাছে অস্পৃশ্য; ওরা ব্রাহ্মণের আচার মানে না; ওদের বিয়ে হয় মালা চন্দনে। অনুষ্ঠান এতো সাধারণ (simple) যে বিয়ে বৈধ বলে মনে হয় না; ওদের বিবাহ বহির্ভূত সঙ্গম স্বাভাবিক ও বৈধ; ওদের ভিতর জারজ সন্তান ভরতি; অধিকাংশই ভিখিরি।

অভিযোগগুলি ঠুনকো। গৃহী জাতবৈষ্ণব-সমাজ সম্পর্কে এসব অভিযোগ তো খাটেই না।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগুরুরা পতিতা এবং শুঁড়াকে দীক্ষা দিতেন না। জাতবৈষ্ণব বাবাজীরা তাদেরও দীক্ষা দিতেন। দীক্ষা-গ্রহণের কারণ একটি প্রতিষ্ঠিত সমাজে আশ্রয়প্রাপ্তি। হিন্দু কাঠামোয় পতিতা এবং শুঁড়ীরা ছিল সমাজচ্যুত। সমাজে বৃত্তি থাকবে, সমাজ তাকে ভোগ করবে, লালন করবে, আর শাস্তি ভোগ করবে বৃত্তিধারী? সামাজিক প্রয়োজনে ও প্রশ্রয়ে বৃত্তি গড়ে ওঠে, বৃত্তিধারীরা তার শিকার মাত্র। তথাগত বুদ্ধ নিজে কত পতিতাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর ধর্মে। পাপবৃত্তি থেকে সরিয়ে এনে সমাজসেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে পতিতা-উদ্ধার যেন একটা বড় ব্রত ছিল। বৌদ্ধ-বিরোধী ব্রাহ্মণরা কি সে-

কারণেই পতিতাদের প্রতি নিষ্ঠুর ছিলেন ? জাতবৈষ্ণব-সমাজে বৌদ্ধ-প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

> সম্ভবত খৃ : ১৪ শতকে নবজাগ্রত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম অনেকাংশে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।
>
> (ডঃ অতুলচন্দ্র ভৌমিক : পূর্বাদ্রি, লোকধন সংকলন—১৯৮৯)।

সেই বৌদ্ধ-প্রভাব সমাজে তখন সক্রিয় ছিল। এখনও সে-প্রভাব যে নেই তা বলা যায় না জোর দিয়ে। বাবাজীদের মনে পরোক্ষভাবে হয়তো সেই বৌদ্ধ-প্রভাবই কাজ করত। এ কথা বলার কারণ, জাতবৈষ্ণব-সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে বৈদিক রীতি—হোম-যজ্ঞ ক্রিয়া নেই। বর্জিত।

বাঙলার সেকালের প্রখ্যাত অভিনেত্রী নটী বিনোদিনী জাতবৈষ্ণব পতিতারই কন্যা। বাল্যকালে তাঁর বিয়েও হয়েছিল জাতবৈষ্ণব ছেলের সঙ্গে। বিনোদিনীর শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় দেখে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রীত হয়েছিলেন। কে বলতে পারে, হয়তো চৈতন্যোপাসক জননীর কন্যা হওয়াতেই বিনোদিনীর পক্ষে চৈতন্য-ভূমিকায় অভিনয়কে অমন সফল করে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

বিধবা এবং কুমারী বৈষ্ণবীদের নামে অনেক কুৎসাই প্রচারিত আছে। সব অভিযোগ মিথ্যা, এ কথা বলা যায় না। শুধু বৈষ্ণব কেন ? উনিশ শতকে কৃষ্ণনগরের আদালতে বসে, বিচারক হিসাবে চণ্ডীচরণ সেন মামলার রায় দানকালে লিখিত মন্তব্য করেছিলেন যে, বাঙলার বিধবাদের শতকরা নিরানব্বই জন অসতী। আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'ব্রজবিলাস' গ্রন্থে বিধবার সঙ্গে ব্যভিচার আর ভ্রূণহত্যা বিষয়ে অনেক কথা লিখেছেন। সে-সব উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ঘরেরই কথা। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র যুবতী বৈষ্ণবদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তো সাধারণ ব্যাপার। তবু এর ভিতরেই বলার মতো কথা এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সমাজসংস্কারক অন্য মহাত্মারা যখন স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রচার করে চলেছেন, তখন কলকাতায় এই বৈষ্ণবীরাই শিক্ষা-আলোকপ্রাপ্তা। বনেদি ঘরের পুরনারীদের শিক্ষাদান-কাজে নিয়োজিত তারাই।

আঠারো শতকের শেষভাগে কলকাতার পোস্তার রাজা সাহেবচন্দ্র বাহাদুরের কন্যা হরসুন্দরী দাসীর অক্ষরপরিচয় হচ্ছে একজন কিশোরী বৈষ্ণবীর কাছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেও অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হতো বৈষ্ণবীদের। এমন কি মিস কুক পরিচালিত ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলেও শিক্ষয়িত্রী হিসাবে বৈষ্ণবীদের নিয়োগ করা হতো। এদেরই উচ্চবর্ণীয়

ভদ্রসমাজে পরিচয় ছিল বোষ্টমী। আর এদেরই অভিভাবক, গুরু ছিল নিন্দিত বাবাজীরা। আর এদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার নায়ক ছিলেন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব গুরুরা।

কিন্তু উচ্চবর্ণের বর্ণাশ্রমী মানুষ বিপন্ন হয়ে কেমন করে বৈষ্ণবীর শরণাপন্ন হয়েছে, তারও দৃষ্টান্ত মেলে। বেশি দিন নয়, প্রাকস্বাধীনতা যুগের কথা। বন্ধুবর বিশ্বনাথ সিংহ নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল খুলনা শহর সংলগ্ন একটি সমৃদ্ধ গ্রামে। তিনি সেই গ্রামেরই এই কাহিনীটি জানিয়েছিলেন বৈষ্ণবী প্রসঙ্গে। গ্রামেরই একটি বিশিষ্ট কুলীন কায়স্থ পরিবারের এক বিধবা মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়রা প্রথমে অতি সংগোপনে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজতে লাগলেন। তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। ক্রমে সেই অদ্ভুত সংবাদ কানাকানি হতে শুরু করল। পরিবারের লোক, আত্মীয়, শুভানুধ্যায়ীরা মহাবিপন্ন। সামাজিক মর্যাদা আর থাকে না। গ্রামে একজন মধ্যবয়সী বৈষ্ণবী ছিল। সে কারও সাতে-পাঁচে থাকত না। কোনও মন্দ আচরণও তার ছিল না। সে নিজের ধর্মকর্ম নিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে বাবাজীরা, কীর্তনের দল আসত। তার বাড়িতে তখন কীর্তন, মচ্ছব হতো। মাঝে মাঝে সে তীর্থভ্রমণে চলে যেত। আর সপ্তাহে একদিন সে ভিক্ষায় বার হতো। শেষ অবধি সেই পরিবারের কর্তা এবং আত্মীয়রা সেই বৈষ্ণবীকে ধরল। তুমি আমাদের গ্রামের লোক, যেভাবে হোক আমাদের মানরক্ষার ব্যবস্থা করে দাও।

এর পর সেই মহিলা একদিন বৈষ্ণবীর সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করতে চলে গেলো। ফিরল তিন-চার মাস পরে। আসলে বৈষ্ণবী মহিলাকে নিয়ে গিয়েছিল নবদ্বীপে। কিন্তু এই সম্প্রদায় ভ্রূণহত্যা করে না। তাই ক'মাস থাকতে হয়েছিল। প্রসবের পর সন্তানকে রেখে দিয়ে মহিলাকে ছেড়ে দিয়েছে। এর ফলে মহিলা তার সমাজে থেকে যেতে পারল। পরিবার এবং আত্মীয়দের মানরক্ষা হলো। গ্রামসমাজ সে-কথা ভুলে গেলো ক্রমে। বিশ্বনাথবাবু এরপর বলেছিলেন—সত্যিই, বৈষ্ণবী সেদিন আমাদের গোটাসমাজকেই রক্ষা করেছিল। এটাও একটা দিক। বৈষ্ণবীরা সেকালে গ্রামে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করত।

তা তো করত। তার বিনিময়ে তারা কি পেত? তিরস্কার, নিন্দা, অপযশ, কলঙ্কের ডালি—এই তো তারা, বোষ্টমী, বাবাজীর সেবাদাসী—ছ্যাঃ! এরা জাতবৈষ্ণবের একটি অংশ।

গোঁড়ামির কারণেই জাত বৈষ্ণবদের ওপর খাপ্পা হয়নি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সমাজ। নিজেদের গোঁড়ামির জন্য তাঁরা সকলকে শিষ্য করতে না পারায় আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। জনসংখ্যা বাড়ছিল শহরে এবং সাধারণ ব্যবসায়ী আর সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা আসছে, তাদের শিষ্য করতে না পারায় গুরু প্রণামীর আয় হচ্ছে না। সেটা বাবাজীরা পেয়ে যাচ্ছে। তাই উচ্চবর্ণের গুরুরা তাঁদের ধনী শিষ্যদের বাবাজীদের হাত থেকে রক্ষা করতে অপপ্রচার করতে বাধ্য হতেন যে বাবাজী আর নিম্নবর্ণের বৈষ্ণবরা অস্পৃশ্য।*

উচ্চবর্ণের গুরুরা যখন দেখলেন যে কুৎসা রটনা করেও বাবাজীদের পসার কমানো গেলো না, তখন তাঁরা ফতোয়া জারি করলেন যে :

> ব্রাহ্মণ গুরু দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নিতে হবে। অথবা উচ্চবর্ণের (অব্রাহ্মণ) ভেকধারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দিয়ে দীক্ষা নিতে হবে। অথবা উচ্চবর্ণের গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৃহীগুরু হলেও হবে। জাত বৈষ্ণবরা নিম্নবর্ণ বা অস্পৃশ্য সমাজ থেকে আগত। ওরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নয়।†

শেষ অবধি উচ্চবর্ণের গুরুরা সফল হয়েছেন। ব্যাপক প্রয়াস এবং প্রচার চালানোর ফলে দীক্ষাগুরু হিসাবে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাগুরু হিসাবে ডাক পড়ে বৈষ্ণব বাবাজীদের। অর্থাৎ আর্থিক ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ গুরুর হস্তগত। বাবাজী-সমাজ এবং আখড়ারও আজ পূর্বগৌরব নেই। গুরুত্ব হারিয়েছে অনেকাংশে।

কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় একবার প্রয়াসী হয়েছিলেন বাঙলার সমস্ত বৈষ্ণব সংগঠনকে একজোট করতে। অর্থাৎ সকলকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংগঠনের আওতায় আনতে। নিঃসন্দেহে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এবং সমর্থন-যোগ্য। ঐক্যবদ্ধ বৈষ্ণব সংগঠন জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারত। সে-সময় তিনি বৈষ্ণবদের যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, তাতে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব। আর সবনিচে স্থান জাতবৈষ্ণবের। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা জাতবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলেই স্বীকার করতেন না। কেদারনাথ বললেন—

* রমাকান্ত চক্রবর্তী : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

† তদেব।

৪

ওদেরও বৈষ্ণব বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে। তবে শর্ত-সাপেক্ষে। শর্ত হচ্ছে :

> ১. জাত বৈষ্ণবদের তন্ত্র সাধনার ও আচারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পুরোপুরি রাধাকৃষ্ণ ভজনা করতে হবে। ২. সনাতন ধর্মের নিয়মাবলী মানতে হবে। ধর্মশাস্ত্র সম্মত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানতে হবে। ৩. একপত্নীক হতে হবে। ৪. ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি, কুটির-শিল্প বা কারিগরি বৃত্তি গ্রহণ করতে হবে।*

শর্তগুলি সুন্দর। জাতবৈষ্ণব-সমাজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিধিবিধানের ভিতরে আনার জন্য এই শর্ত। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, শর্তগুলি আখড়ার বৈষ্ণবদের জন্য আরোপিত। গৃহী জাতবৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে এসব শর্ত অকারণ—দু'একটি ছাড়া। যাই হোক, শর্তের দু' একটি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

১. জাতবৈষ্ণব কিভাবে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় ফিরে যাবে? কোন বর্ণে প্রবেশ করবে? নাকি বৃত্তিহীন একটি বর্ণে পরিণত হবে? এবং ভবিষ্যতে আর কাউকে এই বর্ণে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না? অর্থাৎ তাদের মূলনীতি থেকে সরে এসে রক্ষণশীলতাকে, জাতপাত-ভেদকে মেনে নিয়ে জাতে উঠতে হবে?

২. সনাতন ধর্মের নিয়মাবলী অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ও বৈদিক রীতিনীতিকে মান্য করা?

৩. শর্ত হচ্ছে, একপত্নীক হতে হবে। প্রথম কথা, জাতবৈষ্ণব গৃহস্থরা এক-পত্নীক। যেকালে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তখন তো বাঙলার হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ প্রথা আইনসিদ্ধ ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের সকল সদস্যকে কি এই নীতি মান্য করে চলতে হতো? সেখানে কি বহুপত্নীকতা নিষিদ্ধ ছিল?

অদ্বৈত আচার্যের দুই পত্নী। নিত্যানন্দের দুই পত্নী। শ্যামানন্দের দুই কি তিন পত্নী। আর শ্রীনিবাস আচার্য স্ত্রী বর্তমান থাকতে প্রবীণ বয়সে যুবতীর সঙ্গে প্রেমজ বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বহুবিবাহের ক্ষেত্রে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের তো তুলনা নেই।

ভক্তিবিনোদ প্রভু শিক্ষিত ব্যক্তি। বৃত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে-কারণে অনুমিত হয়, বাঙলার নবজাগরণ আন্দোলন, উনিশ শতকের কলকাতায় যা হয়েছিল, তারই প্রভাবে এই শর্ত তিনি আরোপ করেছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় ব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদি বিষয়ে

কোথাও টুঁ শব্দ করেছেন বলে তো জানা নেই। তাই প্রশ্ন, হঠাৎ জাতবৈষ্ণব-সমাজের ক্ষেত্রে এমন আরোপণ কেন? নীতিগতভাবে অবশ্য তাঁর এই শর্ত অন্যায় নয়।

৪. আরেকটি শর্ত হচ্ছে—ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। ভিক্ষাবৃত্তি নিঃসন্দেহে গ্লানিকর। সমাজ থেকে এ ব্যবস্থা নির্মূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তেমন সমাজগঠন কি সম্ভব হয়েছে? গ্লানিময় সমাজই যে ভিক্ষাবৃত্তির স্রষ্টা। সম্পদ সবই সুযোগভোগীদের করায়ত্ত। সাধারণ মানুষের সামনে কাজের সুযোগ নেই। নির্মম বেকারত্ব—অর্ধাশনে উপবাসে দিন কাটে। নিরুপায় মানুষ ভিক্ষার পথ বেছে নেয়।

মাঝে মাঝে মনে হয়, ভিক্ষাবৃত্তি বুঝি আর্য-সংস্কৃতিরই অবদান। দৃষ্টির সামনে জাগে রবিবর্মার আঁকা ছবি—সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাপ্রার্থী দুর্বাসা মুনি। আর্য মুনিদের অনেককেই ভিক্ষাজীবী রূপে দেখা যায়। সমাজগুরুও তাঁরা। সংসারীও। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং মুনিঋষিরা রাজদরবারে দান ভিক্ষা চাইতেন। রাজকীয় ভিক্ষাজীবী ছাড়া আর কি? সেটাই বা গ্লানিকর নয় কেন? গৌতম বুদ্ধ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন। তাঁর শিষ্যরাও। ব্রাহ্মণ বটু উপনয়ন-কালে বলে থাকে—ভিক্ষাং দেহি। সন্ন্যাস নেবার পর শ্রীচৈতন্য ভিক্ষাজীবী, বৃন্দাবনের গোস্বামীরাও, শেষে বৈষ্ণব-আন্দোলন চলে গেলো ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীদের হাতে। ভিক্ষার নাম হলো 'মাধুকরী'। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি পেল গৌরবের মাত্রা। গৃহস্থের কাছে ভিক্ষাদান হলো পুণ্যকর্ম। দরিদ্র অসহায় মানুষ, অলস ব্যক্তি, সহজ উপার্জনপন্থার সুযোগ নেবেই।

এছাড়া, জাতবৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে আর একটা ভাববার দিক আছে। পূর্বাশ্রম ত্যাগ করে বৈষ্ণবতায় এসে অনেকে তার বর্ণগত বৃত্তিও ত্যাগ করত। পূর্ব-সমাজে বসবাসই হয়তো সম্ভব হতো না। তখন সে কি করবে? অনেকে বৃত্তির কারণেই হীনাবস্থায় ছিল। বৈষ্ণবতা তার উত্তরণ ঘটাল। বৃত্তিপরিচয়-ত্যাগই সে চেয়েছে। এখন সহসা সে কোন বৃত্তি গ্রহণ করবে? কুটিরশিল্প বা কারিগরি বৃত্তি—সে তো বৃত্তিভিত্তিক সমাজে এক একটি নির্দিষ্ট বর্ণের মানুষের করায়ত্ত। সেখানে অনুপ্রবেশ করবে কিভাবে? তাছাড়া সে-সব কাজও তো সীমাবদ্ধ। চাইলেই মেলে না। তখন সে কি করবে? নারীসমাজের তো কথাই নেই। দরিদ্র সমাজের বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা, দরিদ্র পরিবারের কুমারী কন্যা—বাব মা যাকে আহার, পরিধেয় দিতে এবং বিবাহ দিতে অক্ষম—আখড়ায় এসে ভেব

নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছে। এদেশে যুগ যুগ ধরে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে মাধুকরীর প্রচলন বলেই তারাও ধর্মের ভেক নিয়ে ভিক্ষা করে। বাবাজীরা তাদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু জাতবৈষ্ণব মাত্রই ভিক্ষাজীবী ছিল না এবং নেই। অতঃপর কথা হচ্ছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে অনুপ্রবেশের সার্থকতা কি? সেখানে তো সর্বনিম্নস্তরে ঠাঁই হবে। করুণার পাত্র হয়ে থাকা। বাবজীরা কেমন সাড়া দিয়েছিলেন, কে জানে।

একটা বিষয় লক্ষণীয়। জাতবৈষ্ণব সম্পর্কে যত কুৎসাই রটনা করা হোক, যত অস্পৃশ্যই বলা হোক, তাদের কিন্তু জল-অচল করা হয় নি। ফলে জল-অচল সমাজ থেকে কেউ জাতবৈষ্ণব-সমাজে এলে তার জল সচল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পর্ব

ভাই ইস্পাত কারখানার কর্মী। ইঞ্জিনীয়র।

সে একদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল—ধেৎ, বলতেই লজ্জা। আমি কাউকে আমার জাতির কথা বলিনে। সবাই জানে, আমি কায়স্থ।

—কারণ ?

—অফিসে এই জাত নিয়ে কত বিশ্রী ধরনের কথা হয়। বলে, বরগী আবার জাত, তেলাপোকা আবার পাখি। জাত হারিয়ে বোষ্টম। সোজা কথায় বলে বারোজেতে। অর্থাৎ জারজ। একজন লম্পট বাবাজী সেজে একপাল সেবাদাসী নিয়ে লীলা করল, ধর্মের নাম নিয়ে ছেলেমেয়ের জন্ম দিলো। তারাই বরগী বোষ্টম। জন্ম দিয়ে খাওয়াবার দায় নেই। নাকে তিলক লাগিয়ে দিয়ে কাঁধে ঝুলি তুলে দিলো—যাও, হরে কৃষ্ণ বলে ভিক্ষে করো। খোরাক জুটে যাবে। সমাজের আঁস্তাকুড।

আমার স্ত্রী শুনে প্রায় ককিয়ে উঠলেন—ও মা, সে কি কথা! আমরা ওই রকম নাকি ?

বললাম—লোকের কি দোষ ? তারা যা জানে, তাই বলে। আমি গোপন করে পালিয়ে বেড়ালে লোকে জানবে কেমন করে ? আত্মপরিচয় দিলে লোকে থেমে যেত।

—না। আড়ালে হাসাহাসি করত।

—না। ক্রমে নিজেদের ভুল বুঝত।

ভাই বলল—আসলে জাতটা খুব খারাপ। নইলে দেশজুড়ে লোকে ওসব বলবে কেন ?

—বলে, তার প্রথম কারণ, তারা জানে না যে এই সম্প্রদায়ের সবাই আখড়ার বাবাজী নয়, তোমার মতো ইঞ্জিনীয়রও আছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, দলত্যাগী হয়ে পালটা বিরোধী দল খুললে আক্রমণ সইতেই হয়। বর্ণাশ্রমীরা, যারা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়, তারাই দুয়ো দেয়। তারা বলে, জাত হারিয়ে বোষ্টম—যেন তারা তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে ত্যাগ করে এসেছে। হাজার হাজার মানুষ সহসা জাত হারায় না, ছাড়ে।

বারোজেতে অর্থ মিশ্রিত সম্প্রদায়। ওরা যতই কদর্থ করুক। নৃতাত্ত্বিক গবেষক পণ্ডিত সমাজের মতে বাঙালী একটি বর্ণসঙ্কর জাতি। জাতির এই মিশ্রণ ঘটল কিভাবে? সেই সমাজ-ইতিহাস-ধারা কি আজও রচিত হয়েছে? জানতে ইচ্ছে করে, আজকের আমরা কোথা থেকে কিভাবে কোন মিশ্রণ-প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। কে তার সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারবেন? গবেষকরা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, অজানা অন্ধকার অতীত থেকে টুকরো টুকরো খবর তুলে আনছেন। তা দিয়ে একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা চলছে, যাতে আভাস মেলে, আমরা কে, কিভাবে ইতিহাসের পথে হেঁটে চলেছি।

যা খবর মিলেছে, যে-চিত্র কিছু ইঙ্গিতবাহী, তাতে মনে হয়, আমাদের সেই মিশ্রণপর্বগুলো ছিল আলোয় আঁধারে, ভালোয় মন্দে, ন্যায়ে অন্যায়ে মিশ্রিত। পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টিকে যেভাবে সম্ভব গড়ে তুলেছে, সে তাই হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে আপন তাগিদে, তা নিয়ে কারও কিছু বলার বা করার ছিল না। আমরা এসেছি। বাঙালী জাতি গড়ে উঠেছে, এটাই সত্য। জাতবৈষ্ণব-সমাজ সম্পর্কে ভাবতে গেলে মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে। ও সমাজ তো আকাশ থেকে পড়ে নি। নিজেরা মৌলিক কিছু আবিষ্কারও করে নি। অন্ততঃ ওরা তা দাবি করে না। এই জনসমাজ থেকেই রসদ নিয়ে সে গড়ে উঠেছে। এবং লালিত হয়েছে এই সমাজেরই প্রশ্রয়ে বা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে।

বাবাজীরা সেবাদাসী রাখে। এটা তো সাধনসঙ্গিনী রাখারই নামান্তর। তন্ত্রের যৌনযোগাচার প্রবর্তিত সাধনসঙ্গিনী প্রথা। তন্ত্রসাধনা কাদের উদ্ভাবিত, সে-বিচার করবেন পণ্ডিত সমাজ। আমরা জানি, বৌদ্ধতন্ত্র, শাক্ততন্ত্র, শৈবতন্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র কথা। তাহলে কি বলা যায় না যে আর্যরাই এর বাহন? আর্যসংস্কৃতির ভিতরেই এই গুহ্যসাধনা বাসা বেঁধেছিল। তাতে প্রয়োজন হয়েছিল সাধনসঙ্গিনীর। সাধারণভাবে প্রচারিত যে সাধনসঙ্গিনী হিসাবে নিম্নজাতীয়া প্রশস্তা। কেন প্রশস্তা, সে-ব্যাখ্যা সাধারণত শোনা যায় না। কে কি ব্যাখ্যা দেবেন, তা-ও জানি না। কিন্তু মনে একটা ধারণা জন্মায়, তা হচ্ছে, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে ওরা সহজলভ্যা বলে।

ভিন্ন ব্যাখ্যাও মনে আসে। কেউ হয়তো বলবেন, তন্ত্রসাধানায় নিম্নবর্গীয়ারাই পোক্ত ছিল। ওদের নারীরা ছিল এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পটু। তাই তাদের সাহায্যে আর্যরা সাধনায় সহজে সিদ্ধিলাভ করত। কে জানে! তবে ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, বিজয়ী আর্যরা বিজিতদের অন্ত্যজ আখ্যা দিয়ে নিজেদের

বসতি-সীমানার বাইরে স্থান দিয়েছিল। তাদের চলাচল-এর ওপর নানা নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। তারা অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ। কিন্তু তাদের নারী হলো গ্রহণীয়া। অর্থাৎ সাধনক্ষেত্রে প্রশস্তা। কারণ পুরুষদের বন্দী দশা। তারা নিজেদের নারীদের রক্ষা করতে অক্ষম। নিজের ঘরের বা সমাজের নারী নিয়ে এমন সাধনা সম্ভব নয় বলেই কি নিম্নজাতীয়া প্রশস্তা? স্বয়ং রাজা বল্লাল সেন ডোমকন্যা নিয়ে সাধনমত্ত হলেন। তিনিই বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অধিকাংশই উচ্চবর্ণীয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ। সাধনসঙ্গিনী সবই নিম্নজাতীয়া। সিদ্ধিলাভ ক'জনের হতো কে জানে। সিদ্ধির ফলই বা কি? তবে এই পথ ধরে ব্যভিচার হয়েছিল, এটা মনে করা বোধহয় অন্যায় হবে না। রাজ্যবিজয়ী কামার্ত পুরুষের ব্যভিচারের ফলে সেদিন কত জারজ জাত হয়েছিল তার খোঁজ কে রাখে?

সেই অন্ধকার যুগের কথায় মনে পড়ে ইংরাজ আমলে এদেশের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের কথা। তারাও তো পিতার পদবি ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির এটাও তো একটা পথ।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সকলেরই সাধনসঙ্গিনী নিম্নজাতীয়া। কাহ্নপাদ ছিলেন কায়স্থ। তিনি শেষ অবধি সাধনসঙ্গিনী ডোমনীকে বিয়েই করে ফেললেন। হয়তো বিশেষ বেকায়দায় পড়ে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন। ফলে তিনি জাতিচ্যুত হলেন। অর্থাৎ একটি বর্ণসঙ্কর পরিবার সৃষ্টি করলেন তিনি।

আমাদের সাহিত্যে, সামাজিক ইতিহাসে উচ্চবর্ণের কথা এবং কৃতিত্ব প্রসঙ্গও বেশি মেলে। কারণ সবই তাঁদের লেখা, তাঁদের মতো করে লেখা। এটাই স্বাভাবিক। তবু গবেষক-সমাজের কৃপায় বিপরীত তথ্যও মিলে যায়। বর্ণসঙ্করতা প্রতিলোম প্রথাতেও এসেছে। লোকশ্রুতি হচ্ছে: 'ধলভূমের বর্তমান রাজারা ব্রাহ্মণীর গর্ভে রজকের ঔরসজাত সন্তানেরই উত্তরপুরুষ।'* অবশ্য এর ভিন্ন ব্যাখ্যা হচ্ছে—ভূমিজ আদিবাসী পরিবার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু একটি পরিবারের ক্ষেত্রে এমন কথা কেন? অনেক আদিবাসী পরিবারই তো এ পথে এসেছিল।

বলার কথা হচ্ছে, মিশ্রণের ক্ষেত্রে অনুলোম প্রতিলোম, রাক্ষস অসুর, গান্ধর্ব, প্রজাপাত্য, গাণপত্য—কোনও রীতিই অব্যবহৃত থাকে নি। বিবাহ-বহির্ভূত

* ডঃ বিনয় কুমার মাহাত: লোকায়ত ঝাড়খণ্ড।

মিলন, মিশ্রণ, ধর্ষণও বাদ যায় নি। সেই মিলনজাত প্রজাবৃন্দও আমাদের বর্ণসঙ্কর বাঙালী জাতি গঠনের অংশীদার। 'কটা শুদ্দুর, কালো বামুন'—এ প্রবাদ তো সে-কারণেই। এ ক'টা কথা স্বতঃই মনে আসে। এ কথা সত্য যে মানুষের অনেক কার্যকলাপ সামাজিক রীতিনীতি শাসনের বাইরে ঘটে থাকে। আবহমান কাল থেকে জবালারা আছে, এবং সত্যকামরা জন্মায়। তবু কিন্তু দেশ-মধ্যে, সমাজ-মধ্যে পতিতা-সমাজের মতো, হিজড়ে-সমাজের মতো কোনও জারজ-সমাজ গড়ে ওঠে নি। তারা তবে কোথায় গেলো, কোথায় যায়? এরপর আসে উচ্চনীচ ভেদ প্রসঙ্গ। এটা তো সমাজপতি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি। তাঁরা যা করেছেন, তাই হয়েছে।

> ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দু সমাজে উচ্চ স্থানের প্রলোভন দেখিয়ে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সামন্ত রাজাদের ক্ষত্রিয় হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। এবং তাঁদের ক্ষত্রিয় স্বীকৃতি দেওয়ার বিনিময়ে প্রচুর উপঢৌকন এবং নিষ্কর ভূসম্পত্তি আদায় করে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাল যুগে ক্ষত্রিয় লিপ্সার সূচনা ঘটেছিল, তারই ধারা অনুসরণ করে এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে, ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সামন্ত রাজারাও অনুগ্রহপুষ্ট ব্রাহ্মণদের সহায়তায় নিজেদের ক্ষত্রিয় বলতে আরম্ভ করলেন। প্রচুর নিষ্কর ভূমি এবং উপঢৌকনের বিনিময়ে অঘোরী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এই সমস্ত রাজা ও ভূস্বামীদের ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের পৌরহিত্য আরম্ভ করলেন। সেই সঙ্গে তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক কল্পনাপ্রসূত কুলপঞ্জী রচনায় মনোনিবেশ করলেন।*

এইভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর আদিবাসী রাজা, ভূস্বামীরা সুদর্শন ক্ষত্রিয় রাজ-পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে লাগলেন।

বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে এমন তথ্য ভূরি ভূরি মেলে। এমন তথ্যও মেলে যে রাজারা তাঁদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনে আদি কৌমের সমাজের ক্ষমতাবানদের দলে দলে ব্রাহ্মণ পর্যায়ে উন্নীত করে দিয়েছেন। তারা হয়েছে ভূমিজ ব্রাহ্মণ। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় রচিত 'ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত' নদীয়ার 'রাজবংশের ইতিহাস বা পরিচয়-কথা। সেখানে তিনি লিখেছেন:

---

* তদেব।

> এই রাজারা উল্লিখিত চারি সমাজের পতি ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং পূর্ব্বোল্লেখিত সমস্ত কর্মের উপর তাঁহাদের অবিসম্বাদিনী প্রভুতা ছিল।...কদাচারীকে জাতিচ্যুত এবং পতিতকে উদ্ধার করিতেন।... উজানিয়া গোপ সম্প্রদায়ের জল পূর্ব্বে ব্যবহৃত ছিল না। এই রাজারা এই প্রদেশে তাহাদিগকে চালিত করেন। শুনিয়াছি রাজারা যে কোন শূদ্র জাতীয় বালক ক্রয় করিয়া আপনাদের পরিচর্যা কর্মে নিযুক্ত করিতেন, তাহারা যে জাতি হউক না কেন, তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ করিতেন।

এমন কর্ম কত রাজা-মহারাজার হাতেই ঘটেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও করেছেন। বাঙলায় সামাজিক শ্রেণী বা স্তর বিন্যাস এভাবেও ঘটেছে। এই সব তথ্যানুসারে কুলজিগ্রন্থ, বংশলতিকা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে গিয়ে দেখা গেলো দেওয়ালে মুদ্রিত বংশলতিকা টাঙানো। তাতে দেশের বহু মনস্বী ব্যক্তির নাম লেখা আছে, ওই পদবিধারী। নজরে পড়ল একটি নাম। তিনি যশস্বী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর ভাই-এর নাম নেই। ভাই দুর্জন ব্যক্তি। কত জারজের জনক। প্রশ্ন করায় গৃহস্বামী প্রথমে বললেন, স্থানাভাব। তারপর বললেন— ও তো কুলাঙ্গার।

—কিন্তু বংশের একজন তো!

—না। যে চ্যুত, তার নাম থাকবে কেন?

সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাসের এই অসম্পূর্ণতা বিকৃতির নামান্তর। সত্য উন্মোচনের অন্তরায়। ফলে অহমিকার দাস হয়ে যাওয়া। সত্যানুসন্ধানী গবেষকদের কৃপায় মাঝে মাঝে কিছু চ্যুতির ঘটনা নজরে পড়ে। কবি কৃত্তিবাস ওঝা ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। তিনি ভঙ্গকুলীন হয়ে গেলেন কন্যার কারণে।

অদত্তা বহির্গতা ইতি হানি।*

কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা হারিয়ে গেলো অন্ধকার জগতে। সহায়ক হলো বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির। সমাজপ্রভু ব্রাহ্মণের হাত দিয়েই সমাজের ওলট-পালট ঘটেছে নিরন্তর। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁর 'আত্মজীবন চরিত' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহের সপক্ষে আন্দোলনে শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্কে রত, তখন কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় নবদ্বীপের কিছু পণ্ডিতকে উৎকোচে

* উদ্ধৃতি—সুখময় মুখোপাধ্যায়: কৃত্তিবাস-পরিচয়; ১৯৫৯; রিষড়া, হুগলী।

বশীভূত করে তাঁদের দিয়ে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় বিধান লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। অন্য কারণে তা ভেস্তে যায়। সমাজ বিবর্তনে এমন একটা ধারাও বর্তমান ছিল। বাবাজীরা এই পথেরই অনুসারী।

ঝাড়খণ্ডের ভূস্বামীরা আর্য ক্ষত্রিয় হয়ে গেলেন। আদিবাসী ভূমিজ সমাজ থেকে পৃথক হয়ে অতীত পরিচয়কে অস্বীকার করলেন। তা দেখে আদিবাসী ভূমিজ সম্প্রদায়ও ক্ষত্রিয় পরিচয় পেতে আগ্রহী হয়ে উঠল।

এখানেও তেমনি বর্ণাশ্রমী সমাজব্যবস্থায় যারা নিম্নস্তরে পড়ে ছিল, তারা বৈষ্ণবতায় এসে অবস্থান্তর ঘটাতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। বাবাজীরা সেই আগ্রহকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। অভিজাত বর্ণাশ্রমীরা তাদেরই ব্যঙ্গ করেছে। অবজ্ঞা, ঘৃণা, কুৎসার শিকার হয়েছে তারা। ওরা নাকি জাত-হারা জারজ! মালা-চন্দনে বিয়ে নিয়েও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বলা হয়েছে—ওটাকে বিয়ে বলে মানা যায় না। অনুষ্ঠান এত সরল যে বিয়ে বলে মনে হয় না।

বিশ্বে বিবাহ-রীতি কি এক প্রকার?

অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর নিকট আত্মীয়াকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু এদেশে প্রচলিত কোনো বিবাহ-রীতিতে তা গ্রাহ্য নয়। খোঁজ মিলল, স্কটল্যাণ্ডের এক শহরে এ রকম বিবাহ আইনত সিদ্ধ। বিশ্বের আর কোথাও নয়। অতএব তাঁরা সেখানে গিয়ে বিয়ে করে এলেন।

॥ দুই ॥

পরিচয় হলো অধ্যাপক দাসের সঙ্গে। তিনিও বৈষ্ণব। তবে জাতবৈষ্ণব নন। মেদিনীপুরের বৈষ্ণবসমাজের গুরু বংশ। শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকমোহনের দৌহিত্র-বংশ।

বললাম—পরিচয় হয়ে ভালো হলো। বৈষ্ণব-আন্দোলন, বৈষ্ণবসমাজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

—কি বলব?

—যা আপনার কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনারা কোন পরিবার?

এটা হচ্ছে বৈষ্ণবসমাজের প্রতীকী (কোড) ভাষা।

বললাম—আমরা জাতবৈষ্ণব। তবে আমার মা-বাবা অদ্বৈত পরিবারে

দীক্ষিত। সেই সূত্রে আমরা এখন অদ্বৈত পরিবার। তা আপনাদের তো ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে।

—অনেক। তারা আমাদের প্রণাম করে। আমরা আশীর্বাদ করি।

—এটা বৈপ্লবিক ব্যাপার। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রে তো একমাত্র ব্রাহ্মণই প্রণম্য।

—আমরা তো ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের অধীন নই।

—'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থেও তো ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত!

—শ্যামানন্দ তা মানেন নি।

—তিনি তো সব বৈষ্ণবকেই উপবীত ধারণ করিয়েছেন। একটি গ্রন্থে পড়েছি। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে নাকি উল্লেখ আছে?

—তা জানি নে। তবে মেদিনীপুরের বৈষ্ণবদের পৈতে নেই। আমাদেরও পৈতে নেই। চৈতন্যের বৈষ্ণব-আন্দোলন কি চেয়েছিল, জানেন? জাতিভেদ উচ্ছেদ করে সমাজে সাম্য আনতে। স্মার্ত সমাজের চেয়ে উন্নত সমাজ গড়তে।

—কিন্তু এখনও বলা হচ্ছে, চৈতন্য ওসব কিছুই করেন নি।

—হ্যাঁ। সে-চেষ্টা চলেছে। ওটা বিতর্কিত।

—আপনাদের ভেক হয়?

—বেশ? না, হয় না। দীক্ষা হয়।

—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে জাতবৈষ্ণবদের ভেক হয়।

—শুনেছি। ওটা আঞ্চলিক ব্যাপার। ওদিকে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বেশি। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-চৈতন্যের আত্মীয় এবং ব্রাহ্মণ পরিকররা বৈষ্ণব গুরু হওয়ায় তার প্রভাব পড়েছে। আসল ব্যাপার কি জানেন, কেন্দ্রীয়ভাবে বৈষ্ণব-আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। অঞ্চল-ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। যুক্ত হয়েছে স্থানীয় সংস্কার। তবু জাতবৈষ্ণব একটিই সমাজ।

—হ্যাঁ, যার পৈতে আছে, আর যার পৈতে নেই—তাদের ভিতর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধে না।

—কেমন করে বাধবে? উপবীত তো বৈষ্ণবের চিহ্ন নয়। আপনাদের গোত্র কি?

—অচ্যুতানন্দ।

হ্যাঁ, বঙ্গদেশের তামাম জাতবৈষ্ণবের ওই একটাই গোত্র। এই একটি সম্প্রদায় যাদের একই গোত্রে বিয়ে হয়। কারণ অন্য গোত্র নেই। অচ্যুতানন্দ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর উপাসক হলে ওই গোত্র।

—একটা প্রশ্ন আছে।

—কি ?

—যদি বিচ্ছিন্নভাবে, আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে বাবাজীদের দ্বারা জাতবৈষ্ণব-সমাজ গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে সমগ্র বঙ্গদেশে জাতবৈষ্ণবের একই গোত্র এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো কিভাবে ?

—আমার সঠিক জানা নেই।

—জাতবৈষ্ণব বলতে কি শুধু অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য আর ভিখারির দল ?

অধ্যাপক হাসলেন—আপনি কি তাই ? ওটা অপপ্রচার। কত বিত্তবান বিশিষ্ট গৃহস্থ জাতবৈষ্ণব-সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অবশ্য এ নিয়ে সমীক্ষা হয়েছে কিনা, জানা নেই।

—আপনাদের বিয়ে কোন পদ্ধতিতে হয় ?

—বৈদিক রীতিতে।

—শ্রাদ্ধ কত দিনে হয় ?

—এগারো দিনে। আমরা তো বর্ণাশ্রমী। সদ্গোপ। আমাদের কথাই বললাম।

—মেদিনীপুরে জাতবৈষ্ণবদের পদবি কি কি ?

—সবই দাস।

—'দাস অধিকারী' আছে যে !

—আছে। বৈষ্ণব গুরুরা শিষ্যদের কাছ থেকে বার্ষিক খাজনা (প্রণামী) পেতেন। সে-সব আদায়ের জন্য কিছু বৈষ্ণব-শিষ্যকে নিয়োগ করতেন। যাদের এই অধিকার দেওয়া হতো, তারাই 'দাস অধিকারী'।

—মহান্ত নেই ?

—তাও আছে।

—আপনাদের অঞ্চলে লোকে জাতবৈষ্ণবদের ঘৃণা করে না ?

—আপনাদের অঞ্চলে করে ?

—করে। বইপত্র ঘেঁটে দেখেছি, আমরা অচ্ছুৎ, জারজ।

অধ্যাপক হেসে উঠলেন। বললেন—হ্যাঁ, মেদিনীপুরে এককালে ওসব নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। ওমেলি সাহেব ওসব লিখেছিলেন, আদমসুমারিতে। প্রতিবাদও হয়েছিল। বৈষ্ণবরা দাবি তুলেছিল—তারা ব্রাহ্মণ-তুল্য। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণরা হচ্ছেন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ। আর বৈষ্ণবরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব।

॥ তিন ॥

একদিন ভাই এসে তার এক অভিজ্ঞতার কথা জানাল :

অফিসে বসে কাজ করছি। একজন বলল—আপনার ফোন এসেছে।

জিজ্ঞেস করলাম—কে করছেন ?

—এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভের চীফ। দাস সাহেব।

—আমার ফোন নয়। তিনি আমাকে ফোন করবেন কেন ?

—তা জানি নে। ডাকছেন।

উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম। সত্যিই, দাস সাহেব আমাকেই ডাকছেন। বললেন—আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা আছে। দয়া করে একটু আসতে পারবেন, নাহলে আমিই যাচ্ছি।

বললাম—না স্যার, আমি যাচ্ছি।

খুব অবাক হলাম! বিলাত ফেরত, অত বড় পদের মানুষ, আমার কাছে আসতে চান! কি এমন প্রয়োজন! গেলাম ওঁর কাছে। বললেন—সল্ট লেকের ড. দাসকে চেনেন ?

—হ্যাঁ, আমার ভগ্নীপতি।

—হ্যাঁ, তাই লিখেছেন। ওঁর বিবাহ-যোগ্য ভাই আছে ?

—আছে। অধ্যাপক।

—তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। মেয়ে সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাস। আমাকে এ ব্যাপারে একটু সাহায্য করুন। আমার অনুরোধ।

ফেরার পথে বার বার মনে হতে লাগল, দাস সাহেবও তাহলে জাতবৈষ্ণব। অন্ত্যজ।

সন্ধ্যাবেলা কোয়ার্টার্সের বারান্দায় বসে আছি, গাড়ি এসে দরজায় থামল। দাস সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত। স্ত্রীর হাতে স্টিয়ারিং।

ওঁরা ঘরে এসে বসলেন। ওঁর স্ত্রী বললেন—বৌমা কোথায় ? আলাপ করি। স্বজাতীয় মানুষ।

দাস সাহেব বললেন—ছেলেটি সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ! ওঁরা বাঁকুড়ার লোক, আমরাও। এক জেলার মানুষ। ভালো মিলবে। আমার ছেলে নেই। তিন মেয়ে। এটা ছোট। বড় মেয়ে ডাক্তারি পাস করল। তারপর একটি ডাক্তার ছেলেকে বিয়ে করল। ছেলেটি ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য। ওরা দু'জনেই ইংলণ্ডে থাকে। মেজ মেয়ে কলকাতায় এম. এ. পড়ত। বিয়ে করল একটি কায়স্থ ছেলেকে।

ছেলেটি ইঞ্জিনীয়র। কিন্তু আমার মনে দুঃখ। একটি মেয়েকেও নিজে হাতে করে স্বজাতীয়ের ঘরে দিতে পারলাম না!

বললাম—বৈষ্ণবদের তো জাতি-বিচার নেই!

—যে-ঘরে যাচ্ছে, তারা যে বর্ণাশ্রমী।

—আজকাল ওরাও আর ওসব মানছে না।

—কে বলেছে? দাস সাহেবের স্ত্রী প্রতিবাদ জানালেন—বড় মেয়ে ছাড়ল না। ইংলণ্ড গিয়ে এক বছর ওর কাছে ছিলাম। জামাই আদর-যত্ন খুব করত। কিন্তু বড্ড বামুন। মোটা পৈতে ঝুলিয়ে শুধু জপতপ আহ্নিক, নিত্য পুজো। বিষ্যুৎবারে লক্ষ্মীপুজোর কি ঘটা! আবার অন্যের বাড়িতেও পুজো করতে যায়।

—সে-কি! ইংলণ্ড গিয়েও, অসবর্ণ বিয়ে করেও?

দাস সাহেব বললেন—অসবর্ণ বিয়ে করার ফলেই বোধ হয়, অমন অস্বাভাবিক আচরণ। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

ওঁর স্ত্রী বললেন—খুব খারাপ লাগত। নিজেকে ছোট মনে হতো। পালিয়ে বাঁচলাম।

দাস সাহেব ব্যথিত স্বরে বললেন—দু'টো মেয়ে অমন করল। নিজের সমাজে রাখতে পারলাম না। সবাই নিজের সমাজ নিয়ে আছে। নিজেকে কেমন অসম্মানিত মনে হয়।

ওঁর স্ত্রী বললেন—এ মেয়ের বিয়ে সমাজেই দেবো। মালা-চন্দনে বিয়ে হবে, খোল-করতাল বাজিয়ে।

—হ্যাঁ। দাস সাহেব সমর্থন জানালেন। বললেন—ওতে সমাজের ভাবটা জেগে উঠবে। ব্রাহ্মণসমাজকে অস্বীকার করে দাঁড়ানো সমাজ। রেজেষ্ট্রি বিয়ের কত আগে আড়ম্বরহীন মালা-চন্দনের বিয়ে। খোল-সহযোগে মধুর কীর্তন গান।

॥ চার ॥

মুর্শিদাবাদের চক ইসলামপুরের কাছে বড়দো (বড়দহ) গ্রাম। কৃষিজীবী মানুষ আর গোয়ালাদের বাস প্রধান। সেখানে আখড়া খুলেছেন শ্যামাদাস মহান্ত মশায়। জাতবৈষ্ণব। শিক্ষক ছিলেন, অবসর নিয়েছেন।

মনে প্রবল আগ্রহ। জাতবৈষ্ণব-সমাজের আখড়া দেখব। বাবাজীর সঙ্গে কথা বলব, বৈষ্ণবী থাকলে দেখব। বৈষ্ণবীদের সম্পর্কে বাবাজীর কি বক্তব্য, তা জানার চেষ্টা করব। আখড়া বাবাজী আর সেবাদাসী বৈষ্ণবী নিয়েই তো

যত কুৎসা আক্রমণ। নানা রকম মন-মাতানো রোমাঞ্চকর কাহিনীও পড়া যায়। কতটা সত্য? নাকি সবই লেখকের অবদমিত কামনার বিকৃত প্রকাশ? কেমন এদের জীবনযাত্রা? বাঙলার গ্রামে জাতবৈষ্ণব-সমাজ গড়ে তোলায় এঁদের অনেক অবদান।

যোগাযোগ করলে মহান্ত বাবাজী জানালেন—কাল একাদশী ছিল। আজ দ্বাদশী। বেলা দু'টোর পর আসতে পারেন।

যেতে তিনটে বেজে গেলো। চক ইসলামপুর থেকে বহরমপুরগামী বাস-এ একটা স্টপ পরেই বড়দো স্টপ। মোটর গাড়ী থেকে নেমে ধুলো-ভরা পথে অনেকটা হেঁটে গ্রাম পেরিয়ে আখড়া। প্রথমে একটা গোয়ালা বাড়ি, তারপর আখড়া—অনেকটা জায়গা নিয়ে। পুর্ব-দক্ষিণে ফসলের ক্ষেত, উত্তরে ফল-বাগান। শান্ত নির্জন পরিবেশ। পুবমুখো আর দক্ষিণমুখো খানকয় নিচু চালা। পুবে একটি নির্মীয়মাণ পাকা ঘর। সেটা উনিশ-শ ছিয়াশি সাল। সমস্ত উঠোন নিকানো, ঝকৃঝক্ তকৃতক্ করছে। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বেলগাছ উঁচু প্রশস্ত মাটির বেদী করে বাঁধানো। পাশে নলকূপ। ছিমছাম, রুচিকর পরিবেশ। শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস-করা মানুষের চোখে বড়ই রমণীয় স্থান।

বাল্যকালে দেখা সে-আখড়ার মতো নয়। সেটা ছিল মন্দির বাড়ি। বিগ্রহ, পূজার্চনা, সন্ধ্যায় শাস্ত্রপাঠ, কীর্তনের আসর—কত কি হতো। মুণ্ডিত মস্তক, মাথায় শিখা, গলায় কণ্ঠি, বহির্বাস পরিহিত বাবাজী—এই সব নিয়ে আখড়া।

এখানে শান্ত নির্জনতা। মহান্ত মশায় স্বাস্থ্যবান, শ্যামবর্ণ, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, অনাবৃত দেহ উপবীত শোভিত, পরনে লুঙির মত গেরুয়া বহির্বাস। অভ্যর্থনা জানালেন—আসুন! নিকানো উঠোনে খেজুর পাতার পাটি পেতে দিলেন। সামনের চালায় এক মাঝ-বয়সী বৈষ্ণবী গৃহকাজে ব্যস্ত।

—বলুন কি জানতে চান? প্রশ্ন করলেন মহান্ত মশায়।

কথা শুরু হলো। কথায় কথা আসে। বললেন—না, না, আমি সেরকম বাবাজী নই। গৃহী মানুষ। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, সবই আছে। শিক্ষকতা করতাম। অবসর নিয়েছি এ বছরই। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে। পেনসন কবে পাবো কে জানে। শিক্ষকতা করা এদেশে পাপকর্ম, অসম্মানের চূড়ান্ত। আখড়া খুলেছি ক'বছর হলো।

—গৃহস্থ মানুষ, হঠাৎ আখড়া খুললেন কেন?

—গুরুগিরি আমাদের বংশগত ব্যবসা। বাবা করতেন। তিনি গত হয়েছেন। এখন আমি বংশধারাকে বজায় রাখছি। শিষ্য-সেবক আছে। কীর্তন, মালসা

ভোগ দেওয়া, বৈষ্ণবসমাজে পুরোহিতের কাজও করতে হয়। সংসারে থেকে এসব কাজ করা কঠিন। পড়াশোনা, সাধন-ভজন, শিষ্য-সমাজের আসা-যাওয়া-থাকা—তাই এই আশ্রম খোলা।

—ভেক দেন ?

—তা তো দিতেই হয়।

—আমি বলছি, জাতবৈষ্ণব পরিবারের সন্তানদের ভেক দেওয়া হয় ?

—হয়। সংস্কারও করা হয়।

—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তো ওটাকে অন্যায় কর্ম বলে !

—কেন ?

—ডোর-কৌপীন ধারণ তো সন্ন্যাস নেওয়া ! তারপর সে আবার সংসারী হয় কেমন করে ?

—ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়ন হয় কেমন করে ? সেও তো দণ্ড ধারণ করে। সন্ন্যাস নেয়। ভিক্ষা করে। বৈষ্ণবেরও এটা উপনয়ন, দ্বিজত্বপ্রাপ্তি।

একটু থেমে দম নিয়ে মহান্ত মশায় বললেন—নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত সন্ন্যাসী থেকে আবার সংসারী হয়েছিলেন কেমন করে ? ভূত যেমন আছে, তেমনি ভূত ছাড়াবার মন্ত্রও আছে। 'পুনর্মূষিক ভব' মন্ত্র না থাকলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—বৈষ্ণবদের কেউ উপবীত ধারণ করে, কেউ করে না কেন ?

—ভেক-এর সময় উপবীত দেওয়া হয় সকলকেই। কেউ রাখে, কেউ রাখে না।

—ব্রাহ্মণরা তো সবাই রাখে।

—সেই তো কথা। আমাদের সমাজের কি মাথামুণ্ডু আছে ? কে কার কথা শোনে ? আজকাল অনেকে ভেকই নেয় না। বলি, বাবা, বামুনদের দেখো। ওরা নিজের সমাজকে ঠিক মান্য করে চলে। সে-কারণে ওদের মানমর্যাদা আছে। যত অনাচারই করুক, তবু ওরা বামুন। সোনার আংটি। আর লোকে আমাদের হেনস্তা করে।

—কিন্তু বৈষ্ণবের উপবীত কেন ? তার কণ্ঠিই তো বড় চিহ্ন।

—তা ঠিক। তবু বৈষ্ণব হচ্ছে ব্রাহ্মণের সমপর্যায়ের। বৈষ্ণব শূদ্র নয়। সমাজে পৈতের বড় কদর। ওটা না থাকলে লোকে মানে না।

—কিন্তু ব্রাহ্মণকে অস্বীকার করেই তো জাতবৈষ্ণবের সৃষ্টি। আবার তবে ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করা কেন ?

—অস্বীকার কোনটা? তার শ্রেষ্ঠত্ব? তারা বলছে, পূজাপাঠের, ধর্মচর্চার একমাত্র অধিকারী তারাই। আমরা বলছি, না, আমরাও অধিকারী।

—বিয়ে দেন?

—দেবো না কেন?

—মালা-চন্দনে বিয়ে হয়?

—না। যজুর্বেদীয় মতে।

—মালা-চন্দনে বিয়ে হয় না?

—এখন আর ওসব হয় না। লোকে হাসে। খুব যারা গরিব, মোটে খরচা করতে পারে না, তারা করে—তাও হয় না।

—শ্রাদ্ধ কিভাবে হয়?

—শ্রাদ্ধ হয় না। বৈষ্ণবের পিণ্ডদান নেই। অশৌচ পালন করে। মহাপ্রভুর ভোগ দিয়ে শুদ্ধ হয়। আসলে কিন্তু বৈষ্ণবের অশৌচ ছিল না। খাওয়ার বিধি ছিল না। তেরাত্রি পালন করতে হতো, সিদ্ধ পক্ক খেয়ে। কীর্তন দিয়ে বৈষ্ণব ভোজন করালেই সব কাজ শেষ হয়ে যেত। এটা অবশ্য আমার শোনা কথা।

—হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই ওঠে না।

—হ্যাঁ, তাদের অশৌচ আর কে পালন করবে। বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজের মধ্যে বাস করার ফলে আমাদের সমাজের রীতিনীতিও পালটে যাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের পাশে সংখ্যালঘু থাকলে যা হয়।

বিকাল নেমেছে। বৈষ্ণবী উঠোনে ঘুরঘুর করছে।

মহান্ত মশায় বলে উঠলেন—আমাদের একটু চা দিও গো, মেয়ে।

মেয়ে! আমার উপন্যাস-পাঠের মেজাজ ধাক্কা খেলো। সেবাদাসী নয় তাহলে?

মহান্তমশায় সম্ভবত আমার মনোভাব বুঝেই বললেন—আমি তো এখানে সব সময় থাকিনে। ওই মেয়েই সব দেখে। বিধবা, বাপের বাড়িতে ছিল, ভাইরা রাখতে চায় না। আমার শিষ্যা। এসে বলল, কি করি এখন? বললাম, এখানেই থাকো। তাই আছে। খুব দুঃখী। বাইরে থেকে সমাজকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না। গুরুগিরি করতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। মানুষ তার হাজার সমস্যার কথা তুলে ধরে। মেয়েদেরই বেশি। সেকালে আখড়ায় অত মেয়েমানুষের ভিড় হতো কেন? বিধবা আর স্বামী-পরিত্যক্তারা প্রাণের দায়ে আখড়ায় ছুটে আসত। তাতে কিছু এলোমেলো কাণ্ড হতো বৈকি।

—এখনও ওই ভাবে মেয়েরা আসে?

—নেবে কে? আখড়া খুলে একবার ডাক দিয়ে দেখুন। এখন তো নানা ধর্মীয় এবং সরকারী আশ্রম খোলা হয়েছে অনাথাদের জন্য। তবু আখড়া খুলে ডাক দিয়ে দেখুন। আর সেকালে তো আখড়াই সম্বল ছিল। আখড়া ছাড়া হতভাগিনীদের আর কোন্ আশ্রয় ছিল? শুধু গালমন্দ করলে তো হয় না।

বৈষ্ণবী চা দিয়ে গেলো।

বসে ভাবছিলাম, আখড়া আর সেবাদাসীর উৎস কি তবে বৌদ্ধ-বিহার—ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ? আখড়া কি বৌদ্ধ-বিহারের অনুকরণ? জাতবৈষ্ণবের সঙ্গে বৌদ্ধ-সমাজের কোথায় যেন একটা মিল আছে বলে মনে হলো। হিন্দু কাঠামোর মধ্যে বৌদ্ধসমাজের চাপেই বুঝি গড়ে উঠেছিল জাতবৈষ্ণব-সমাজ।

মহান্ত মশায় এক সময় বলে উঠলেন—মহাপ্রভুর তত্ত্ব কি বলুন তো?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম—আপনিই বলুন।

—বলছি। পুঁথির কথা বলব না। নিজে যা বুঝেছি, তাই বলব।

—হ্যাঁ। সেটাই শুনব।

—রাজা সুবুদ্ধি রায়ের গল্প। হুসেন শাহের বেগম প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কারাগারে বন্দী সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ করল মুখে গো-মাংস ঠেকিয়ে। তারপর তাঁকে মুক্ত করে দিলো। বৃদ্ধ রাজা বাইরে এসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন—বিধান চেয়ে। হিন্দু হয়ে থাকতে চাই। কি করতে হবে, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত? পণ্ডিতরা বিধান দিলেন, তপ্তগলিত কাঞ্চন গলাধঃকরণ করতে হবে।

—সে কি। সে তো নিশ্চিত মৃত্যু!

—ওটাই বিধান। বিকল্প নেই। নবদ্বীপ, কাশী—সর্বত্র পণ্ডিত সমাজের ওই একই বিধান। কাশীতেই সুবুদ্ধি রায় দেখা পেয়ে গেলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর। বললেন, প্রভু, আপনি কি বলেন? আমি বাঁচতে চাই। আমার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে থাকতে চাই। মহাপ্রভু বললেন, গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে বলো, হরি বোল। সুবুদ্ধি রায় তা-ই করলেন। মহাপ্রভু বললেন, যাও, তুমি মুক্ত। পবিত্র।

কাহিনী থামিয়ে মহান্ত মশায় বললেন—ইনিই আমাদের মহাপ্রভু। এটাই তাঁর বাণী—তত্ত্ব। মানুষ বাঁচতে চায়, উঠে দাঁড়াতে চায়, সুন্দর হতে চায়। তাকে শাস্ত্রীয় তপ্তগলিত স্বর্ণ পান করিয়ে হত্যা করা হবে কেন? তাই মহাপ্রভুকে মাথায় নিয়ে জাতবৈষ্ণব-সমাজ গড়া হয়েছে। মহান্ত মশায়ের কণ্ঠ আবেগে জড়িত।

প্রশ্ন করলাম—আপনার বাড়ি নদীয়া জেলায়। মুর্শিদাবাদের এই গ্রামে আখড়া খুললেন কেন?

তিনি হাসলেন—ভাবছেন, কোনো শিষ্যের ঘাড় ভেঙে জমি দখল করে এসব করছি? না। এ জমিটা আমার মাতুল বংশের। এখানে বাইশ বিঘার একটা ফল-বাগান ছিল তাঁদের। ছোটখাটো জমিদার ছিলেন। তারপর, যা হয়। গরিব হয়ে গেলেন। জমি প্রায় সবই বেহাত। পিছন দিকে খানিকটা বাগান আছে। লোকে দখল করে নিচ্ছে সব। আমিও এটুকু নিয়ে আখড়া খুলেছি। এরপরই তিনি মাতৃকুলের যিনি এই সম্পত্তির পত্তন করেছিলেন তাঁর নাম করলেন। পদবি চক্রবর্তী।

চমক লাগল শুনে। বললাম—ব্রাহ্মণ পরিবার?

—হ্যাঁ।

মনে মনে হাসলাম। জাতবৈষ্ণব-সমাজের এই এক প্রবণতা। সবাই বলতে চায়, তারা উচ্চবর্ণসম্ভূত। তথাকথিত ইতিহাস বলে অন্য কথা। সব নিম্নবর্ণাগত। যারা উচ্চবর্ণের, সামাজিক সুযোগভোগী, তারা জাত ছেড়ে উঁচু থেকে নিচু হবেই বা কেন? চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ তো বৈষ্ণবগুরু হয়ে চুটিয়ে শিষ্য করে জমিদারি ফাঁদবে।

মহান্ত মশায় বললেন—এক শরিক বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তিনি আমার দাদামশায়ের ঠাকুরদা।

—তাঁরা কেউ নেই?

—আছে। গরিব হয়েছে। দুই শরিকই চক-ইসলামপুরে বাস করে। এক শরিক বামুন, আরেক শরিক বৈষ্ণব। তিনি হাসলেন—লোকের ধারণা, জাত-বৈষ্ণব মানেই ভিখিরি আর ছোটলোক। তা নয়। বামুন যেমন মুসলমান হয়েছে, খ্রীস্টান হয়েছে, তেমনি জাতবৈষ্ণবও হয়েছে। জাতবৈষ্ণব পাঁচ-মিশেলি সমাজ। এখানে উঁচুও আছে, নিচুও আছে। জাতবৈষ্ণব খুঁজতে শুধু আখড়ায় গেলে হবে না, সমাজে ঘুরতে হবে। হাজার হাজার গৃহস্থ আছে—জাতবৈষ্ণব—যারা ভিখিরি নয়। উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, জমিদার, জোতদার—আবার ভিখিরিও আছে। যারা গুটি কয় ভিখিরি দেখে জাতবৈষ্ণবের পরিচয় বোঝে—তারা কাঁচা।

মহান্ত মশায়ের কথাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। আমি তো এক খ্রীস্টান পরিবারকে জানি, যাদের আরেক শাখা হিন্দু হয়েই আছে। একটি মুসলমান পরিবারের কথা জানি—যাদের মূল অংশ হিন্দুই আছে আজও। এবং দু'পক্ষই একই শহরে বসবাসকারী। তবে মহান্ত মশায়ের মাতুল বংশেই বা তা সম্ভব হবে না কেন?

সন্ধ্যা নামছে। বৈষ্ণবী প্রদীপ নিয়ে উঠোন পরিক্রমা করছে। কণ্ঠে কীর্তনের সুর।

বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। মহান্ত মশায় দূর সম্পর্কে আমার আত্মীয়। অতএব তিনি বলতে থাকলেন—আজ এখানে থেকে যান। রাতে নিরিবিলিতে অনেক কথা হবে। মনে অনেক কথা জমে আছে। আমাদের সমাজকে লোকে হেয় করে—এর সপক্ষে বলার মতো লোক নেই বলে। আমার তো লেখার চর্চা নেই।

বৈষ্ণবী ঘরে উঠছে। তার কণ্ঠে গীত আরও স্পষ্ট হয়েছে।

পথে পা বাড়ালাম।

রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা ইসলামপুর-চকের এক বৈষ্ণব পরিবারে। সেখানে ফিরে শ্যামাদাস মহান্তর মামার বাড়ির কথা তুলতেই গৃহকর্ত্রী বললেন—হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির পিছনেই সে-বাড়ি।

—ওঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আরেক শরিক বামুনই আছেন?

—হ্যাঁ।

—কোথায় থাকেন?

গৃহস্বামী বললেন—বুড়ো ঠাকুর? আগে ওই বাড়িতেই ছিল, এখন বাজারের মধ্যে উঠে গিয়েছে।

—কি করেন?

—পুরুতের কাজ। আর দোকানে হিসাবের খাতাপত্র লেখে।

—ওঁরা কি স্বীকার করেন এক পরিবারের লোক বলে?

—তা করবে না কেন? শরিক তো। বুড়া ঠাকুরকে ডাকিয়ে আনছি।

বুড়া ঠাকুর ডাকনাম। পোশাকী নাম যাদবেন্দু চক্রবর্তী। বাবার নাম বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অন্যপক্ষে রামানন্দ দাস ও সুধীর দাস—দু'ভাই। বাবা কিশোরী দাস। দুই পরিবার এখনও বিষয়-সম্পত্তির শরিক। পরিবারের নিয়ম হচ্ছে, বড়দোর বাগানে ফল পাকলে সবাই সেখানে খাবে। বংশের বড় ছেলে প্রথম ফল পাড়বে—ঠাকুরের ভোগ দেবে। তারপর শরিকদের মধ্যে ফল ভাগ

হবে। আগে রামানন্দ প্রথম ফল পাড়তেন। তাঁর মৃত্যুর পর বুড়া ঠাকুর পাড়েন। একটা দৃষ্টান্ত মিলল। উচ্চবর্ণের মানুষ জাত খুইয়ে স্বেচ্ছায় জাতবৈষ্ণবের খাতায় নাম লিখিয়েছিল।

আশ্রয়-দাতা পরিবার ব্যবসায়ী। সচ্ছল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কণ্ঠিধারী। ছেলেরা স্কুল-কলেজের ছাত্র। মেয়ে বি.এ. পরীক্ষার্থিনী।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জাতবৈষ্ণব-সমাজ সম্পর্কে এক সমীক্ষকের লেখা পড়েছিলাম। সবাই নিম্নবর্ণজাত বা অবৈধ বিবাহ জাত। ভিক্ষা এদের মূল বৃত্তি। হালে কৃষি, ব্যবসা এবং চাকরিতে অনেকে যোগ দিয়ে অন্য উপাধি ও জাতি পরিচয় গ্রহণের ফলে জাতবৈষ্ণবদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার পথে।

এঁরা দেখলাম গোঁড়া পরিবার। কীর্তন গাইতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী—দু'জনেই।

বললাম—ভেক হয় আপনাদের পরিবারে?

—হ্যাঁ, হয়। তিন ছেলের হয়েছে। দুই ছেলের দিতে হবে।

—বিয়ে মালা-চন্দনে হয়?

—না। মন্ত্র পড়ে হয়।

—শ্রাদ্ধ?

—মহাপ্রভুর ভোগ হয়।

—এখানে জাতবৈষ্ণব আরও আছে?

—অল্প ক'ঘর আছে।

—বৃত্তি কি?

—ব্যবসা, মাস্টারি, ডাক্তারি।

—কি ডাক্তার?

—এম.বি.বি. এস।

—এখানে লোকে আপনাদের ঘেন্না করে না?

—ঘেন্না করবে কেন?

—নিচু জাত বলে।

—তা তো এখানে কেউ বলে না। এখানে অধিকাংশই তন্তুবায়। ধনী রেশম ব্যবসায়ী। আমার বড় ছেলে পাস করে ব্যবসা করছে। বিয়ে দেবো। তন্তুবায়রা বলছে, আমাদের মেয়ে নাও, অনেক টাকা-পয়সা দেবো। আমি বলেছি, জাতের মেয়ে নেবো। দাদা থাকে বহরমপুরে। তার ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে বামুনের ঘরে।

—সামাজিক বিয়ে ?

—তা ঠিক নয়। তবে বিয়ে হয়েছে সামাজিকভাবে, উভয় পক্ষের সম্মতিতে। মেলামেশাও আছে দুই পরিবারের মধ্যে। আমরা শূদ্র নই। ব্রাহ্মণের সমতুল্য।

—আপনারা জাত ছেড়ে অন্যজাতের মধ্যে ঢুকে যেতে চাচ্ছেন ?

—কি যে বলেন ! জাত ছাড়ব কেন ? যাব কার মধ্যে ? এক বামুনের মধ্যে যাওয়া যায়।

ব্যাপারটা চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সমতার চিন্তা এই বৈষ্ণবসমাজে চারিত হয়ে কত গভীরে প্রবিষ্ট। অন্যদিকে প্রচার চলছে, ওরা অচ্ছুৎ, ব্রাত্য।

গৃহস্বামী বললেন—আমাদের স্বজাতীয় পরিবার মুর্শিদাবাদে অনেক আছে। বড় বড় ধনী আছে। বহরমপুরে, কান্দীতে, জিয়াগঞ্জে আছে।

—হ্যাঁ, জানি।

—আপনি জানেন ?

—জানি। বহরমপুরে একটি পরিবারকে জানি, যাদের ছেলে ডবলিউ.বি.সি.এস। জিয়াগঞ্জের ধনী স্বর্ণব্যবসায়ী—তাদের একটি পরিবারের দুই জামাইকে জানি। একজন রাইটার্সে বড় চাকুরে। অন্যজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আমেরিকার পি.এইচ.ডি.।

—চকেও একটা আখড়া আছে।

বললাম—আপনারা ওই আখড়ার অধীন ?

—না। আমাদের গুরুদেব ব্রাহ্মণ।

—আখড়ায় বাবাজী আছেন ?

—হ্যাঁ, আমরা একজনকে থাকতে দিয়েছি।

—তার মানে ?

—প্রায় একশ বছর আগে আখড়াটার জন্ম। গ্রামের একটি লোক, পাড়ারই এক বিধবার সঙ্গে ভাব-ভালবাসা করে ফেলল। পাড়ার লোক বলল, ওভাবে তো চলবে না। তোমরা বিয়ে করো। বিধবার বিয়ে তো সমাজে থেকে হবে না। আর একজাতও নয়। তাই তারা ভেক নিয়ে সংসার পাতল। তখন পাড়ার লোক বলল, নবশাক পাড়ায় থাকা চলবে না। তারা সেখান থেকে উঠে এসে এখানে বাড়ি-ঘর করল। তাদের সন্তান হয় নি। তারা মারা গেলে গ্রামের লোক ওটা নিয়ে আখড়া করে দিলো। ট্রাস্টি আছে। এখন এক বাবাজীকে রাখা হয়েছে। গ্রামের লোক মাসিক চাঁদা দেয়। তাতেই চলে। আর একজন বৈষ্ণবী আছে।

—বৈষ্ণবীও আছে ?

—হ্যাঁ, এক বুড়ী আছে। এর আগে ওরাই স্বামী-স্ত্রী থাকত। স্বামী মরে গেলো। কেউ নেই। বুড়ী আর কোথায় যাবে ? আখড়ায় একজন কাজের লোক তো দরকার।

পরদিন সকালে আখড়ায় বসে বাবাজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হলো। সুপুরুষ প্রৌঢ়।

বললেন—আদি নিবাস রাজশাহী। জাতবৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। ভেক হয়েছিল। সংসারধর্মও করেছি। পরিবারবর্গ মালদহে থাকে। তারপর আমি ধর্মাশ্রয়ী হয়েছি। ভারতের সব বৈষ্ণবতীর্থ পরিক্রমা করেছি। তারপর দীক্ষা নিয়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছি। এখানে থাকি। কিন্তু সুখ পাইনে। বসে দু'দণ্ড শাস্ত্র আলোচনা করব, তার লোক মেলে না। ব্যবসায়ী সমাজ মাসিক চাঁদা দিয়ে খালাস। আখড়ায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে, পড়ে নষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যায় আসর করলে লোক হবে না। কেমন করে তবে আখড়া চলবে ? আমার কাজ হচ্ছে লোকের বাড়ি ঘুরে মাসিক দেয় চাঁদা আদায় করে বেড়ানো। নইলে খাব কি ?

মানুষটি শিক্ষিত, ভদ্র, মিষ্টভাষী।

উঠে আসবার সময় বললাম—একটা প্রশ্ন করব ?

—বলুন।

—আপনার কণ্ঠি আছে। ওটাই তো বৈষ্ণবের চিহ্ন। আবার উপবীত কেন ?

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বাবাজী বললেন—ভেক নেবার সময় থেকেই ওটা আছে। ত্যাগ করি নি। বললেন আরও—ঠিক বলেছেন, কণ্ঠিই আমাদের চিহ্ন। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন ? আপনাকে বলি ব্যাপারটা। আখড়ার মালিক তো গ্রামবাসী—নবশাক সমাজের মানুষ। তাদের কাছে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। তাদের পুরোহিত পৈতে-ধারী ব্রাহ্মণ। ওরা বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বোঝে না। সংস্কারে আবদ্ধ। ওরা এখানে ভোগ-রাগ দেয়। ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে খায়। পৈতেহীন পুরুত হলে ওদের ঠিক মন ওঠে না। তাই পৈতেটা রাখি। অপ্রয়োজনীয় হলেও।

বাবাজী দাস মশায় হাসলেন। বস্তুত নিরুপায় হাসি।

জাতবৈষ্ণব পরিবার দীক্ষাগুরু করছে ব্রাহ্মণকে, তা নিয়ে গৌরববোধ করছে। আখড়ায় বাবাজীরা উপবীত ধারণ করছেন। ব্রাহ্মণত্বের এই সংস্কার জাতবৈষ্ণব আন্দোলনের পরাজয়ের ঘোষণা ছাড়া আর কি ?

সমীক্ষক হয়ত ঠিকই বলেছেন—এ সমাজ অবলুপ্তির পথে।

॥ পাঁচ ॥

বড়দোর আখড়ায় বসে শ্যামাদাস মহান্ত বৈষ্ণবী প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন, মনে সেগুলো ঘুরছেই। আখড়া খুলে ডাক দিলেই দলে দলে মেয়েরা এসে বৈষ্ণবী হয়ে যাবে এখনও। বৈষ্ণবী কেন হয়? শুধু কি আর্থিক কারণেই? না, শ্যামাদাস যা বললেন, তা হলো আর্থিক এবং সামাজিক কারণে। যেমন বড়দোর বৈষ্ণবী এসেছে। যেমন চক-এর বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর *Bengal Peasant Life* গ্রন্থে বৈষ্ণবী হবার একটি কাহিনী পরিবেশন করেছেন। তিনি একটি কৃষিজীবী পরিবারের কাহিনী লিখেছেন। বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের একটি আগুরি পরিবারের কথা। পরিবারটি বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু তারা বর্ণাশ্রমী। যেমন ধর্মীয় গুরু আছে, তেমন কুল-পুরোহিত আছে।

বৈষ্ণব-আন্দোলন বিষয়ে গবেষকরা অনুযোগ করেন যে, এই আন্দোলন সাহিত্য-সঙ্গীতে অবদান রেখেছে, কিন্তু সমাজসংস্কার—অর্থাৎ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ, বিধবা-নির্যাতন বিরোধী কোনো আন্দোলন করে নি। কেমন করে করবে? এই সব অপকর্মই তো উচ্চবর্ণ, বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবদান। বৈষ্ণব-আন্দোলন শেষ অবধি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছে। ফলে উচ্চবর্ণীয় বৈষ্ণব-আন্দোলনেও এসেছে গতানুগতিকতা। বাস্তব সমস্যার দিকে পিছন ফিরে ঘরে বসে কৃষ্ণনাম জপ করে আত্মমুক্তির চিন্তাই প্রধান হয়েছে। লালবিহারী দে-র গ্রন্থে তাই দেখা যায়, এই সামন্ত পরিবারের পুরোহিতের বাবার মৃত্যু হলে তাঁর মাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে সতী করে দেওয়া হলো।

কিন্তু নিম্নবর্ণের সমাজে সতী প্রথা নেই। এই কৃষিজীবী সামন্ত পরিবারের ছোট বউ আদুরীর স্বামীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হলো। আদুরী বিধবা হলো। সে যুবতী এবং নিঃসন্তান।

গতানুগতিক হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের চল নেই। তার পড়ে-থাকা সুদীর্ঘ জীবন এবং ভরা যৌবনের জন্য করণীয় শুধু কৃচ্ছ্রসাধন। আত্মনিপীড়ন। তার সংসারে ভাশুর আছে, জা আছে, শাশুড়ী আছে। সংসারে সচ্ছলতা আছে। কিন্তু আদুরীর কি আছে? স্বামী বর্তমানকালেও আদুরী সুখী ছিল না। মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট ছিল সে। প্রথমত সন্তানহীনা। দ্বিতীয়ত স্বামী সন্দেহপ্রবণ। বাড়িতে প্রেমভক্ত নামে এক বৈরাগী ভিক্ষা নিতে আসে। আদুরী তাকে ভিক্ষা

দিলো। অমনি স্বামী ঘরে এসে বলল—তুমি ভিক্ষা দিতে গিয়ে বৈরাগীর দিকে তাকালে, হাসলে। আমি গোয়াল থেকে স্পষ্ট দেখলাম।

আদুরী অভিযোগ অস্বীকার করল। ফলে সে মার খেলো স্বামীর হাতে। এই মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে এল তার মানসিক বিকার। সে উন্মাদিনী হলো। লজ্জাশীলা আদুরী এখন ভাশুরের সামনে উলঙ্গিনী হয়ে নাচতে, গাইতে, হাসতে লাগল। অতএব ওঝা এল ভূত ছাড়াতে। ওঝা বলল—তুই কোথায় ছিলি?

ভূত বলল—পুকুর পাড়ের তালগাছে।

—একে ধরলি কেন?

—ও যে লোকের দিকে তাকায়, হাসে।

এই সামান্য উক্তি থেকেই তার ক্ষোভ, অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। তার ভাশুরের সামনে দিগম্বরী নৃত্য তো তার অতৃপ্ত কামনা-বাসনারই প্রকাশ। যে ভাশুরের সন্তান আছে, সক্ষম পুরুষ—তাকেই সে বলতে চেয়েছে স্বামীর অক্ষমতা-অযোগ্যতার কথা। অর্থাৎ সে অতৃপ্ত, অসুখী তার দাম্পত্য জীবনে।

সেই আদুরীই বিধবা হয়ে গেলো। হিন্দুসমাজ বিধবা নারীর জন্য সুস্থ বিকল্প জীবন-পথ কিছু খুলে দিতে পারে নি। তাদের জন্য হয় সহমরণ, নাহয় আমৃত্যু আত্মনিপীড়ন নির্ধারিত। শূদ্রের যেমন ব্রাহ্মণের সেবা করা কাজ, বিধবার তেমনি পরিবারের জীবন উপভোগকারী সকলের সেবা করা কাজ। বিদ্রোহ করলে বা এই সামাজিকতা থেকে সামান্য চ্যুত হলেই ঠাঁই হয়ে যাবে আঁস্তাকুড়ে। অর্থাৎ পতিতালয়ে। একে সামাজিক নিষ্ঠুরতা না বলে বলা উচিত সমাজের নির্মম নিরুপায়তা—অসহায়তা, অক্ষমতা, আবদ্ধতা।

আদুরীর শাশুড়ী কৃষ্ণনাম জপ করে দিনে দু'বার। দুপুরে আহারের আগে একবার আর সন্ধ্যায় একবার।

এখন আদুরীরও কাজ হয়েছে একশ আটবার করে ওই কৃষ্ণনাম জপ করা। কিন্তু সে নিয়মিত কাজ করতে পারে না। শাশুড়ীর মতো। যাই হোক, এখন শাশুড়ীর পথই তার পথ। কেননা দু'জনই বিধবা। যদিও শাশুড়ী বৃদ্ধা, পুত্র পৌত্র নিয়ে সংসার। আর আদুরী নিঃস্ব অথচ যুবতী।

ভাশুরপোর বিয়ে হলো জাঁক করে।

শাশুড়ী মনের খুশি নিয়ে বলল—যাক, এবার আমার কাজ চুকল। এবার তীর্থ করে আসি। পাড়ার দুই মহিলা সঙ্গীও জুটে গেলো। আদুরী বলল—আমিও যাব। আমারই বা সংসারে কোন বাধা?

ভাশুররা অনুমতি দিয়ে দিলো। অতঃপর আদুরীও তীর্থ করতে বের হলো। অম্বিকা কালনায় গেলো। নবদ্বীপে গেলো। তারপর অগ্রদ্বীপে এল।

অগ্রদ্বীপে তখন গোপীনাথের মেলা বসেছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের সমাবেশ। কত রকম সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম। বৈরাগী, বাউল, নাগা, নেড়ানেড়ী। সমানে চলেছে নাচ আর গান। অহর্নিশি সংসারের আবদ্ধজীবনের বাইরে এ যেন আনন্দের মুক্তাঙ্গন। কত দিন ধরে চলবে এই মেলা। অতএব আদুরীরা থেকে গেলো সেখানে। আনন্দ উপভোগের জন্য। দেখে বেড়াতে লাগল মেলার নানা রূপ। নেড়ানেড়ী, বৈষ্ণবী, সবাই নিজ নিজ দলে বিভক্ত হয়ে আস্তানা পেতেছে। আর সেখানে একসঙ্গে নাচছে গাইছে। নারী পুরুষ একসঙ্গে নাচছে গাইছে। নারী পুরুষ ভেদ নেই। এখানে নারীর ঘোমটা নেই। আবরু নেই। বিধিনিষেধ নেই। সব একাকার। এ যেন এক আশ্চর্য জগৎ, মুক্ত পরিবেশ। এখানে নিন্দা নেই, গঞ্জনা নেই, সন্দেহজাত লাঞ্ছনা নেই।

একদিন ওরা এক জায়গায় দেখল, খুব ভিড় জমেছে। খোল-করতাল বাজনার সঙ্গে এক বৈরাগী উদ্দাম নৃত্য করে গান গাইছে। তার পরনে কৌপীন মাত্র সম্বল। কত রকম ভঙ্গিতে সে নাচছে। ভাবে বিভোর। হঠাৎ সেই নৃত্যরত বৈরাগীর নজর গেলো দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আদুরীর দিকে। অমনি সে ভাবের ঘোরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অচৈতন্য হলো। তার মুখ দিয়ে গাঁজলা বার হতে লাগল। সঙ্গীরা তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে লাগল। তখন কাছে এসে আদুরীরা এই দৃশ্য দেখতে গিয়ে দেখল, এই বৈরাগী তাদের গ্রামের সেই প্রেমভক্ত, যাকে নিয়ে আদুরীর লাঞ্ছনাভোগ হয়েছিল স্বামীর হাতে।

প্রেমভক্তর সঙ্গীরা বলল—ওর দশা হয়েছে। অর্থাৎ দেবতার ভর হয়েছে ওর ওপর।

সঙ্গীরা শুধাল—কে এসেছেন ?

প্রেমভক্ত বলল—আমি গোপীনাথ।

—আপনার কি আদেশ ?

—মেলায় একটি বিধবা যুবতী এসেছে। তাকে বৈষ্ণবী করে আমার সেবায় লাগাও।

—সে কোথায় ?

—মাঠের উত্তর-পূব দিকে গাছতলায় তিনজন মেয়েমানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

তারা তাকাতেই আদুরীকে দেখল। অমনি সেখানে ছুটে গিয়ে তাকে দেবতার আদেশের কথা শোনাল।

সে-কথা শুনে গ্রাম্য মহিলারা বিস্ময়ে রুদ্ধবাক।

প্রেমভক্তর দলনেতা এবার ফলাও করে শোনাতে লাগল—স্বয়ং গোপীনাথ তাঁর সেবার জন্য ডাকছেন। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়! মহাভাগ্যবতী! বলুন মত আছে কি না। আদুরী একটু ভেবে নিয়েই রাজি হয়ে গেলো বৈষ্ণবী হতে। সম্মতি জানাল—হ্যাঁ। বৈষ্ণবী হব।

এদেশে ধর্মক্ষেত্রে এই এক বিশেষ স্বাধীনতা। গৌরাঙ্গের দাদা বিশ্বরূপ বললেন, সন্ন্যাস নেব। নিলেনও। কেউ বাধা দিতে পারলেন না। গৌরাঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জননী-জায়া-সংসার, আত্মীয়-পরিজন সব গৌণ। তারা শোক করতে পারে। বাধা দিতে পারে না। আদুরীর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটল। শাশুড়ি ও সঙ্গিনীরা বাধা দিতে পারল না।

তখনই আদুরীকে নিয়ে গিয়ে ভেক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো এবং তার বৈষ্ণবী-জীবনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তাল প্রেমভক্ত বৈরাগীর ওপর।

এই বৈরাগীরা সংসার-বৈরাগী। বৈষ্ণবীরও বিয়ে দেওয়া হবে না। এরা একসঙ্গে বসবাস করবে এবং ধর্মচর্চা করবে। জীবিকা হিসাবে এরা প্রত্যেকেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে। বস্তুত এরা স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন। পুরুষ নারী উভয়েই ইচ্ছামতো তার সঙ্গী বদল করতে পারবে। বাধ্যবাধকতার দায় নেই।

লেখক ঘটনাটিতে প্রেমভক্তর কপটতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ধর্মের নামে ব্যভিচার কেমন চলে, এটাই দেখাতে চেয়েছেন। বিবরণটির সূচনার শিরোভাগে একটি বাঙলা ছড়ার ইংরেজি অনুবাদ বসিয়েছেন। বাঙলা ছড়াটি হলো :

মাগুর মাছের ঝোল
ভরা যুবতীর কোল
বোল হরি বোল।

এর লৌকিক অর্থ যেমন আছে, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও তেমনি শোনা যায়। ছড়াটি নিত্যানন্দের নামে প্রচলিত। লেখক লৌকিক অর্থকেই গ্রহণ করেছেন বলে ধারণা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বিবরণটি উপস্থাপিত করেছেন। লেখক খ্রীস্ট ধর্মের পাত্রী। খ্রীস্টীয় সদাচারে বিশ্বাসী। তাই আখড়ার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর জীবন তার ভালো না লাগারই কথা। তবু তিনি এই বাস্তব জীবনচিত্র আঁকতে যথেষ্ট নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

একালে বসে বিষয়টা ভাবতে গেলে মনে অনেক কথাই জাগে। কঠোর রক্ষণশীল সমাজের বুকে আখড়াকেন্দ্রিক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর উদ্ভব হলো কিভাবে—যদি পিছনে শক্তিশালী সামাজিক সমর্থন না থাকে? স্বতঃই মনে পড়ে অবক্ষয়িত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কথা। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী থেকে নেড়া-নেড়ী। তারই আরেক রূপ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। একে সাহায্য করেছে গৌরাঙ্গ-আন্দোলনের নারীমুক্তির ডাক। সহমরণ নয়। বিধবা হয়ে গৃহে অন্তরীণ থাকাও নয়। বৈধব্য যখন জীবনের সব রঙ-আশা-আকাঙ্ক্ষার সামনে কালো পর্দা নামিয়ে দিয়েছে, তখন ত' থেকে বেরিয়ে আসার নতুন পথ খুলে দিয়েছে এই বৈষ্ণব আখড়া। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেই বিশ্বভুবন তোমার সামনে খোলা। পতিতা হতে হবে না। পতিতালয়ে গিয়ে বাধ্যতামূলক পঙ্কিল জীবনযাপন করতে হবে না। স্বাবলম্বী, সহজ, স্বাধীন হয়ে যাবে অনেক—অনেক।

আতুরী অকস্মাৎ ভাবে বিভোর হয়ে হঠকারী কাজ করে নি। অসহায় অতৃপ্ত বন্দী জীবন থেকে সে মুক্তি-প্রত্যাশী ছিলই। প্রেমভক্ত ছিল তার দুঃখময় জীবনের নায়ক। অবশ্যই অগ্রদ্বীপের মেলা তাকে প্রভাবিত করেছিল। সে জানত, এখানে নিন্দার অবকাশ নেই।

এই আখড়া আর বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের জীবনযাত্রাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে—এরা বিবাহ-বহির্ভূত সঙ্গমে অভ্যস্ত এবং তা বৈধ। ওদের সমাজ জারজে পূর্ণ।

কিন্তু অক্ষম সমাজ শত শত এই দুঃখী রমণীর মুক্তির আনন্দকে মূল্য দেয় নি। তবু ওরা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে বন্দিশালা থেকে।

এসব শুনে এক বুদ্ধিজীবী বন্ধু বলে উঠলেন—দারুণ।

—কি রকম?

—এ তো আধুনিক প্রগতিবাদী পৃথিবীর কথা। উইমেনস লিব্ আর লিভ্ টুগেদার তত্ত্ব তো এসব কথাই বলছে। নারীকে তার নিজের মতো করে বাঁচতে দিতে হবে। সে স্বাবলম্বী হবে। সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। পুরুষের সঙ্গিনী হিসাবে সমমর্যাদায় বাস করবে। প্রয়োজনে জুটি বদল হবে। বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সন্তান হলে লালন করবে সমাজ। অর্থাৎ জারজ বলে কিছু থাকবে না। আখড়ার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের ব্যাপারটা তো তাই দেখছি। স্বাবলম্বী, বাধ্যবাধকতাহীন জুটি।

—সন্তান হলে কি করত ?

—ওই যে, সমাজ লালন করত ?

—না হলে আর জারজ হয় কেমন করে ?

বন্ধু গালে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন—এই বাংলাদেশের সাধারণ সমাজে এমন ব্যবস্থা—সেকালে—ভাবা যায় না।

হাসতে হলো এসব কথা শুনে।

বন্ধু বললেন—আতুরীর ঘটনা কত কাল আগে ?

—আঠারো শ চুয়াত্তর সালে।

—ওঃ! একশ বছর অতিক্রান্ত! মানতেই হয়, বৈষ্ণব-আন্দোলনই সেদিন আমাদের সমাজকে ভালো রকম নাড়া দিয়েছিল।

—উচ্চ সমাজ তাতে যোগ দেয় নি। তা দেয় নি বলেই অনেক বিকৃতি প্রবেশ করেছে। শুনতে ভালো লাগলেও বাস্তবে হয়তো অনেক কিছুই মান্য করা যাবে না। বিশেষত ওই জীবন সুস্থ সংসার-জীবন গড়ে তুলতে পারে নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন তাই অনেক বলিষ্ঠ এবং ইতিবাচক। তাই বা আমাদের সমাজ মানল কোথায় ?

বন্ধু বললেন—তবু আখড়া-সমাজ একটা নতুন স্রোত বইয়ে দিয়েছিল, এটা মানতেই হবে।

—না মানলেও এসব তো ঘটনা। ঘটেছে। বাস্তব সত্য।

আরেক বন্ধু রবি বিশ্বাস বললেন—বৈষ্ণবী এখনও হয়। এবং সংসারও পায়। আমি জানি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

—কি রকম ?

—আতুরী বৈষ্ণবী হয়েছে আঠারো শ চুয়াত্তর সালে। আমার ঘটনার কাল উনিশ শ ছেষট্টি।

রবি বিশ্বাসের বাড়ি নদীয়া জেলার হাঁসখালি থানার অন্তর্গত পাতরাপাড়া গ্রামে। এটি তাঁর গ্রামেরই ঘটনা। তিনি শোনালেন :

আমি তখন বগুলা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সমাজ-সেবায় উৎসাহী। সেই সুবাদে স্থানীয় ফুড কমিটি গঠিত হলে আমাকে তার আহ্বায়ক করে দেওয়া হলো। আমি অবশ্য তা গ্রহণ করলাম না। কিন্তু আমাকে সবাই বিশ্বাস করত। ফলে অনেক সময় দুঃস্থদের খয়রাতি সাহায্য দেবার জন্য সুপারিশ-পত্র লিখে দিতাম। বি.ডি.ও. অফিস তা মান্যও করত। তারা সাহায্য পেত।

একদিন জেলেপাড়ার একজন এল। আগেও এসেছে। মধ্যবয়সী মানুষ। অসুস্থ। ফলে রাতে নদীতে জাল টানতে পারে না। দিনে জনমজুরও খাটতে পারে না। একেবারে অক্ষম। বেকার। অথচ সংসার আছে, বউ ছেলেমেয়ে আছে। সংসার অচল। মেয়েটাকে চিনি। সাবালিকা হয়েছে। আঠারো-উনিশ বছর বয়স। স্বাস্থ্যবতী। জীর্ণ বসনে ঘুরে বেড়ায়। বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই। অথচ অনেকের দৃষ্টি তার দিকে।

লোকটি এসে বলল—এবার দশ কেজি গম লিখে দাও।

—সে কি! আমি দু' কেজি দিই, নাহলে পাঁচ কেজি। তুমি যে একেবারে দশ কেজি চেয়ে বসলে। পাঁচ কেজি নাও।

—না। তুমি দশ কেজিই লিখে দাও।

—আমি লিখলেও অফিস তা দেবে কেন?

—তুমি একটু ভালো করে লিখে দাও আমার হয়ে। তুমি লিখলেই দেবে।

—ব্যাপার কি বলো তো? দশ কেজি লিখে দিতে হবে বলছ কেন? পাঁচ কেজি নাও। পরে আবার পাঁচ কেজি নিও।

—না। দিলে দশ কেজিই দিতে হবে।

—কেন? খুলে বলো তো।

—খানিক দম ধরে থাকার পর সে বলল—খোকা (সে ওই নামেই আমাকে ডাকত), তোমার কাছে হাত পেতে যখন ভিক্ষে চাইতে এসেছি, তখন তোমার কাছে বলতে আর লজ্জা নেই। আমার মেয়েটা পোয়াতী।

চমকে ওঠা ছাড়া আর বুঝি কিছু করার ছিল না।

সে বলল—মেয়েকে আর পথে দেখতে পাও?

—না।

—দেখবে কেমন করে? ছ'মাস হলো।

—কি ভাবে হলো?

সে বলল—আমরা তো গরিব মানুষ। আমার রোগ হবার পর সংসার একেবারেই কাহিল। সমর্থ মেয়ে, আঠারো বছর বয়স, হাঁপাল চেহারা, বিয়ের যুগ্যি। কিন্তু আমরা কি মেয়ের বিয়ে দিতে পারি? আমার মতো মানুষের মেয়েকে কে বিয়ে করবে বলো? সেই মেয়েই বাজার-হাট করত। লোকজন-বাবুদের ধরে খয়রাতি সাহায্য আনা—সবই করত। তা করতে গিয়েই এই হাল। কি বলব, বাবুরা আমাদের মাথা হয়ে বসে আমাদেরই মাথা খায়। এরপর সে

এমন একজনের নাম করল, যা শুনে নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না। বিশিষ্ট ব্যক্তি।

সে বলল—মেয়ে ওর কাছে যেত খয়রাতি সুপারিশ-পত্র লিখে নিতে। দুপুরে যেতে বলত। তখন ওর বউ স্কুলে পড়াতে যায়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে। মেয়ে যেত। তাকে দিয়ে সংসারের কাজ করিয়ে নিত। পরোটা রুটি খেতে দিত। খেতে-না-পাওয়া মেয়ে সেটা পেয়েই বসে খেত। আর তারপর—কি আর বলব তোমাকে—

—দশ কেজি গম নিয়ে কি করবে?

—এটা নিয়ে পিষিয়ে বাড়িতে দেবো। তারপর মেয়েকে নিয়ে বেরোবো।

—কোথায় যাবে?

—কপাল যেদিকে নিয়ে যায়।

এরপর পনেরো কেজি গমের জন্য সুপারিশ-পত্র লিখে দিয়ে ওর হাতে ক'টা টাকাও দিয়েছিলাম। আর মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ওকে দু'কেজি চাল দিয়ে বলেছিলাম—আজ দু'টো ভাত খেও সবাই মিলে। সে কেঁদে ফেলেছিল।

পনেরো কেজি গমই পেয়েছিল শুনেছিলাম। তারপর সত্যিই সে নিরুদ্দেশ। অনেক দিন পর তার বাড়িতে খোঁজ নিতে গেলে তার বউ-এর কি কান্না। বলল —কি জানি মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় যে গেলো। আর কোনো খোঁজই নেই।

বেশ কিছুকাল পর সে বাড়ি ফিরেছিল। আমার কাছে আর আসে নি। তার কিছুদিন পর মারা গেলো।

তারপর সে-কথা মনের কোন তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। নিজের জীবনের সহস্র সমস্যা নিয়েই দিন মাস বছর কেটে যায় হু হু করে।

প্রায় এক যুগ পরের কথা।

একদিন নবদ্বীপের পথে হেঁটে চলেছি আপন মনে। হঠাৎ পথের পাশ থেকে প্রশ্ন হলো—দাদা, কেমন আছেন? বামা কণ্ঠ। মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। পাশেই এক মহিলা দাঁড়িয়ে। কালো, স্বাস্থ্যবতী, বছর ত্রিশ বয়স হবে, নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠি। বৈষ্ণবী। সে হাসল।

অবাক হলাম। কে এই বৈষ্ণবী?

সে বলল—চিনতে পারছেন না?

—না তো।

—আপনার বাড়ি তো পাতরাপাড়া?

—হাঁা, কিন্তু আপনি কে?

সে হেসে বলল—আমার বাপের বাড়িও ওখানে। আপনাকে দেখেই চিনেছি।

—কিন্তু আপনার নাম কি, বাবার নাম কি?

সে এবার তার আত্মপরিচয় দিলো। মুহূর্তে সেই দূর অতীত সামনে এসে দাঁড়াল। আরেকবার ভালো করে ওর দিকে তাকালাম।

সে বলল—বেঁচে আছি দাদা। তবে আপনি সেদিন পনেরো কেজি গম না দিলে আর বাঁচতাম না। সেদিনই গলায় দড়ি দিতাম।

—তুমি এখানে থাকো?

—হ্যাঁ। এই তো কাছেই আমাদের আখড়া। সেখানে থাকি। আসুন না আমাদের বাড়িতে! দেখে যান নিজের চোখে কেমন আছি।

কৌতূহল রোধ করা গেলো না। তার সঙ্গে চলতে চলতে বললাম—তুমি বৈষ্ণবী হয়েছ?

—হ্যাঁ দাদা। বিয়ে হয়েছে যে গুঁসাইয়ের সাথে।

—গোঁসাই থাকে ওখানে?

—হ্যাঁ, তেনারই আখড়া।

পথের পাশেই আখড়া। আসলে একটা ছোট বাড়ি। ইটের দেওয়াল, টালির চাল মাথায়—খান দুই ঘর। একটা বড়-সড় উঠোন—খুব ছিমছাম। ঘরে একটা মাদুর পেতে দিয়ে বলল—বসুন।

—এটা ভাড়া-বাড়ি?

—না। গুঁসাই কিনে নিয়েছে।

—গোঁসাইয়ের তাহলে টাকা আছে?

সে হাসল। তারপর তার নিজের কথা শোনাতে চাইল।

—কেমন আছ?

—খুব ভাল আছি। সবই তো জানেন। বাবা অক্ষম হয়ে গেলো। আমার বিয়ে হতো না কোনদিনই। বউ হতে আর পারতাম না এ জীবনে। পাঁচজনের ভোগে লাগতে হতো। অনেকেই সেই ফিকিরে ঘুরত। একজন তো ভোগ করেই নিল। তারপর আর দরজা খুলত না। চিনতে পারত না। আমি মরণের কথাই ভাবতাম। কিন্তু আপনি গম দিলেন, চাল দিলেন, টাকা দিলেন। আর মরা হলো না। বাবা আমাকে নিয়ে চলে এল। নবদ্বীপের পথে পথে পাগলের মতো বাবা ঘুরল কত দিন আমাকে নিয়ে। শেষে এই গুঁসাইয়ের কাছে আশ্রয়

মিলল। আমার খালাস না হওয়া অবধি বাবা এখানেই ছিল আমার কাছে। তারপর আমার ছেলে হলো।

—সে ছেলে আছে ?

—হ্যাঁ, গুঁসাই তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। ছেলে এখন চায়ের দোকানে কাজ করে। তারপর গুঁসাই আমাকে বিয়ে করল। ভেক দিয়ে বৈষ্ণবী করে। তেনাকেও একটা ফল দিয়েছি। সেটাও ছেলে। স্কুলে ভর্তি করেছি।

—তাহলে তো ভালোই আছ।

—তা বলতে পারেন। সবই মহাপ্রভুর কৃপা।

—তোমরা মাধুকরী করো ?

—হপ্তায় একদিন। নিয়মরক্ষের জন্য।

—চলে কিসে তাহলে ?

—গুঁসাইয়ের অনেক ভক্ত আর শিষ্য। তারা দেয়-থোয়। আখড়ায় কেত্তন মচ্ছব মালসাভোগ লেগেই আছে। কত লোক আসে। দাদা, এমন জীবন পাবো তা ভাবিনি। লোকে খুব মান্য করে। মাঠাকরুণ বলে। পায়ের ধুলো নেয়। বোষ্টম তো উঁচু জাত।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে। বাবাজীর পরিচয় কি ? তার সমাজছাড়া এই ঔদার্য এল কেমন করে ?

রবি বিশ্বাস বললেন—তা জানি নে। হয়তো সেও এমনি এক জারজ।

হ্যাঁ, এ তো সাময়িক উত্তেজনায় কিংবা ভাবাবেগে অথবা লোকের হাততালি পাওয়ার লোভে পরোপকার করতে যাওয়া নয়। সামাজিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে একজনকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচা এবং সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাওয়া সামাজিক জীবন নিয়ে। এ বিষয়ে গবেষণার একান্ত অভাব। সাহিত্যের পাতায় যা মেলে, তা বিতৃষ্ণা আর ঘৃণাই জাগায়। অথচ এই জীবন চলেছেই।

॥ ছয় ॥

আখড়া নয়। এখন গৃহস্থের জীবনে, পারিবারিক পরিবেশে খুঁজতে হবে জাত-বৈষ্ণব সমাজকে। শ্যামাদাস মহান্তর এই পরামর্শকে শিরোধার্য করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলো।

পশ্চিম দিনাজপুর। বালুরঘাট শহর।

রাধারমণ মহান্ত সেখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। উচ্চতর বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক। সাহিত্যিক, সাংবাদিক। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সন্ধ্যাবেলা তাঁকে বাড়িতে পাওয়া গেলো। আত্মীয়তা থাকায় সমাদর হলো একটু বেশিই। তারপর আলোচনার পালা। সবচেয়ে বড় সংবাদ মিলল যে তাঁরা ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করে জাতবৈষ্ণব-সমাজভুক্ত হয়েছেন।

—কে সেই আদি পুরুষ, যিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন? তাঁর নাম কি জানা আছে?

—বসুন। বলে রাধারমণবাবু ঘরে গেলেন। একখানা মোটা খাতা নিয়েএলেন। বললেন—লিখে নিন, আদিপুরুষ পুরুষোত্তম মুখোপাধ্যায়। নিবাস ছিল বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত চকপাড়া গ্রাম—সাপাহার। তাঁকে দীক্ষা দেন বা ধর্মান্তরিত করেন গয়েশপুরের বামনবিহারী গোস্বামীর বাবা—যিনি সাহেব গোস্বামী নামে খ্যাত ছিলেন। কারণ তিনি উইলিয়ম কেরীর নীলকুঠিতে চার্জ-অফিসার ছিলেন।

অতঃপর পুরুষোত্তম মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বৈদিক সংস্কার ও উপবীত ত্যাগ করে জাতবৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ করলেন। আখড়া স্থাপন করলেন। পদবি নিলেন মহান্ত। বালুরঘাটে সেই আখড়া এখনও বর্তমান আছে। এখন আর পারিবারিক সম্পত্তি নয়। এঁরা জনসাধারণের উদ্দেশে আখড়াকে দান করে দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনাদের বিবাহ-পদ্ধতি বা রীতি কি?

তিনি বললেন—এখন তো মন্ত্র পড়ে বৈদিক প্রথাতেই বিয়ে হয়।

—আপনাদের ভেক হয়?

—হয়। আমার ছেলেদের ভেক হয়েছে।

ওঁর স্ত্রী ছোট ছেলের ভেকের একটি ফটো দিলেন আমাকে। মুণ্ডিত মস্তক, সন্ন্যাসী বেশে একটি বালক।

ফটো দেখে উপনয়নপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ বটু বলে মনে হলো। তফাৎ এই যে বালকের নাকে রসকলি, ললাট চন্দনচর্চিত, পরনে বহির্বাস। বৈরাগী মূর্তি।

—আপনারা কি উপবীতধারী?

—না। পূর্বপুরুষ উপবীত ত্যাগ করে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। আমরা আর তা গ্রহণ করি নি।

—বিয়ে-থা'র ক্ষেত্রে কি গোষ্ঠী বিচার আছে?

—বিচার আর কি! আপনাদের সঙ্গেই তো আছি। তবে পরিবার দেখতে হয়। বৈষ্ণব হলেই তো হয় না!

—মৃত্যু হলে আপনাদের ক্রিয়াকলাপ কি ?

—আমরা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করি। দাহ করি না।

—এখনও এ রীতি পালন করেন ?

—বছর তিনেক আগে আমার এক দাদা মারা গেলেন। তাঁকেও সমাধি দেওয়া হয়েছে।

—কোথায় সমাধি দেন ?

—নদীর ধারে আমাদের নিজস্ব জমি আছে। সেখানেই দেওয়া হয়।

আখড়া যখন ওঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তখন পরিচালক ছিলেন মোহনচন্দ্র মহান্ত (১৯২০ সাল)। তারপর ছিলেন রবিলোচন মহান্ত। পুরোহিত ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র ফৌজদার (এটিও বৈষ্ণবদের একটি পদবি)। এঁর পর ছিলেন অক্ষয়কুমার মহান্ত—কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

—এখন কি এ অঞ্চলে কোনো পরিবার ধর্মান্তরিত হয়ে বৈষ্ণব হয় ?

—মাঝে মাঝে হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর একটি বর্ধিষ্ণু মাহিষ্য পরিবার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছে। গৃহকর্তার পূর্বনাম ছিল নিত্যরঞ্জন মণ্ডল। হয়েছেন নিত্যরঞ্জন দাস। ছেলেমেয়ের বিয়ে এখন আমাদের সমাজেই হচ্ছে। আরেকটি পরিবার আছে। তারা ছিল নেড়া (বৌদ্ধ)। বৈষ্ণব হয়ে এখন আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। বিয়ে-থা আমাদের সমাজেই দিচ্ছে।

মুর্শিদাবাদের বড়দো আখড়ার শ্যামাদাস মহান্ত বলেছিলেন, ধর্মান্তরিত এখনও হয়। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল ভিন্ন সুরের।

তিনি বলেছিলেন, ধর্মান্তরিত হয় নিচু সমাজ থেকে। চৈতন্যপ্রেমে নয়, ধাক্কায়। খুব গরিব, খেতে পায় না, ভিক্ষে করতেও লজ্জা পায়। ভেক নিয়ে ভিক্ষে শুরু করে। কেউ নিচু জাত, কোনও ভাবে পয়সাকড়ি করেছে। উঁচু হতে চায়। তখন ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়। কিছুদিন আগেই এমন একটা ঘটনা ঘটেছে। আমার কাছেই ভেক নিল। তারপর একদিন বাড়ি যেতেই বৌমা বলল, অমুকের মেয়ের বিয়ে হলো। তারপর বৌমা যে বিবরণ দিলো তা শুনে আমি থ। বেটা জাত পালটাতে না পালটাতেই অপকর্ম। আমারই আত্মীয়ের মেয়েকে বিয়ে করে বসল।

বৌমা বলল—কি হলো বাবা ?

বললাম—ভালোই হয়েছে গো। মহাপ্রভু তো আচণ্ডালকে কোল দিতে বলেছেন।

ব্রাহ্মণত্ব ছেড়ে জাতবৈষ্ণব হওয়ার দু'টি তথ্য মিলেছে। তাহলে বলা যায় যে এই সমাজ নিছক অন্ত্যজ আর ভিখারি নিয়ে গড়ে ওঠে নি। আখড়ার গ্রাম্য বাবাজীদের বাইরে ব্রাহ্মণ গোস্বামীর দীক্ষিত ধর্মান্তরিত জাতবৈষ্ণবও আছে। সাহেব গোস্বামী ছিলেন নিত্যানন্দ পরিবারভুক্ত।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকে। ব্রাহ্মণ গুরুর ব্রাহ্মণ শিষ্য কেন ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করে জাতবৈষ্ণব-সমাজে চলে এলেন? আজ বোধহয় এর উত্তর পাওয়া কঠিন। বৈষ্ণব গোস্বামীরা সকলেই বর্ণাশ্রম মান্যকারী। শ্যামানন্দ, রসিকানন্দ সদ্‌গোপই ছিলেন। ব্রাহ্মণ গোস্বামীর তো কথাই নেই। জাতবৈষ্ণব-সমাজ সৃষ্টির উৎস তাই রহস্যময়ই থেকে যায়।

॥ সাত ॥

মালদহ জেলার ইংলিশবাজার শহরের মকদমপুর অঞ্চলে বোনের শ্বশুর বাড়ি। একদা বিত্তবান ছিল। বড় বাড়ি সংলগ্ন ঠাকুরবাড়ি। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতর বড় আকারের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। নিত্যপুজোর আয়োজন। এই বিগ্রহের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল অনেক—ধানের জমি, পুকুর, আমবাগান। এঁদেরও দাবি, ব্রাহ্মণ থেকে বৈষ্ণব হয়েছেন। সকলেই সুদর্শন। এই বাড়ির কর্ত্রীর দেহান্তর ঘটেছে। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান হচ্ছে। বাড়ি ভর্তি লোক। বড় পরিবার। আত্মীয় কুটুম্ব এসেছে নানা শহর ও গ্রাম থেকে। একসঙ্গে জাতবৈষ্ণব-সমাজের এত লোক দেখা লাভজনক বৈকি। নারীর সংখ্যাই বেশি। এবং গ্রাম্য। শিক্ষিতও কিছু আছে।

পারলৌকিক কর্ম বলতে বৈদিক রীতির শ্রাদ্ধকর্ম—পিণ্ডদান, পুরোহিতের সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ, ষোড়শোপচারে দান—খাট-বিছানা, ধুতি-শাড়ি, ছাতা-জুতো, ঘড়া-থালা-বাটি, চাল-ডাল, আরও কত কি সাজিয়ে দেওয়ার ব্যাপার, এখানে এসব কিছুই নেই।

বৈষ্ণব বাবাজী এসেছেন। চৈতন্যপুজোর আয়োজন হচ্ছে। ভোগরাগ সাজানো হচ্ছে। ভোগরাগ বলতে মালসাভোগ। মাটির মালসায় চিড়া দই সন্দেশ ক্ষীর ফল নানাবিধ সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চৈতন্যপুজো শেষ হলেই, সেই ভোগের প্রসাদ খেলেই অশৌচমুক্তি। ভোগারতির সময় চলবে কীর্তনগান।

তারপর হবে মচ্ছব (মহোৎসব)। অর্থাৎ সকলের ভোজনপর্ব। কাজেই আত্মীয়-কুটম্বদের করণীয় কিছু নেই, জটলা করা ছাড়া। এক মহিলাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে অন্য মহিলারা। তার অপরাধ, সে সকলকে বলছে—মেয়ের বিয়ে দেবো, পাত্তর দেখে দাও।

অন্যরা বলছে—তোমার মেয়ে যে অনেক পড়াশোনা করেছে। পাস-করা ডাক্তার হয়েছে।

—তা হোক। মেয়ে পড়ে চাকরি করে কি করবে? বিয়ে দেবো। ওর বাবা মাস্টার ছিল, ওই রকম একটা মাস্টার ছেলে হলেই হবে।

—তোমার মেয়ে বিয়ে করবে মাস্টারকে?

—করবে না কেন?

গ্রাম্য বৈষ্ণব পরিবারের একটি মেয়ে সহসা এম.বি.বি.এস.পাস করে ফেলেছে, তার মা এই মহিমার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না, এটা তারই প্রকাশ। তাই হাসাহাসি।

খানিক দূরের আরেক মহিলাদল থেকে একটি গানের কলি ভেসে এল :

না পুড়াইও রাধা অঙ্গ
না ভাসাইও জলে।

আসলে তর্ক বেধেছে, মৃতের সৎকার নিয়ে :

—এরা দাহ করেছেন।

—ছিঃ ছিঃ। এ কি কথা! বৈষ্ণবের দেহকে দাহ করা—আগুনে দেওয়া—এ তো শুনি নি! সমাধি হলো না?

বাড়ির ছেলেরা শিক্ষিত। তাদের একজন বলল—ধেৎ। চীন দেশে আইন করে সমাধি দেওয়া বন্ধ করছে। আর একজন সেই সমালোচনাকারীকে বলল—আপনাদের সমাধি দেওয়া হয়?

—না। জলে ভাসিয়ে দেয়।

ছেলেরা বলে উঠল—বীভৎস।

বাড়ির বড় বউ জানাল—ওই মানিকচকে আমার বোনঝির ভাশুরকে জলে ভাসিয়েছিল। ক'দিন পরে পচা মড়া গাঁয়ের ঘাটে ভেসে এল। ঘাটের লোক গালমন্দ করতে লাগল। আর বোনঝির জা মড়া দেখে ভিরমি গেলো। তারপর পাগল দশা। ঝাড়ফুঁক কত, ভূতে ধরেছে বলে।

ছেলেরা বলল—জলে ভাসানো সামাজিক অপরাধ। জল দূষিত হয়।

তবু সমালোচনা থামে না। অশিক্ষা আর গ্রাম্য কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানসিকতা বর্ণাশ্রমী সমাজের মতোই আচারসর্বস্ব রক্ষণশীলতা। কিন্তু এর ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেল, জাতবৈষ্ণব-সমাজের প্রধান রীতি হলো মৃতদেহের সমাধি দান। বিকল্প রীতি হচ্ছে, মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া। দাহ নয় কোনো মতেই।

জাতবৈষ্ণব-সমাজে, বিবাহ, মৃতের সৎকার, পারলৌকিকক্রিয়া—সবক্ষেত্রেই অনাড়ম্বর আয়োজন। অর্থব্যয়ের ভূমিকা সামান্য। দরিদ্র জনসাধারণ যাতে বিপন্ন না হয়, সেদিক চিন্তা করেই এইসব রীতি প্রবর্তিত হয়েছে মনে হয়।

শোনা গেলো, এই বাড়ির দৌহিত্রদের ভেক হয়েছে সম্প্রতি। তারা থাকে এই শহরেই বাঁশবাড়ি পল্লীতে।

দেখার ইচ্ছা হলো। গেলাম। যেতেই সামনে এসে দাঁড়াল দু'টি কিশোর। পরনে ট্রাউজার, খালি গা, মুণ্ডিত মস্তক, গলায় পৈতে।

ওদের বাবা জ্যোতির্ময় দাস একজন শিক্ষক। তিনি এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে খাতির করে দোতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললেন—দুই ছেলের একসঙ্গেই ভেক দিলাম।

—হ্যাঁ। তা শুনেই তো দেখতে এলাম। অনুষ্ঠানটা দেখার ইচ্ছা ছিল

—দেখেন নি?

—না।

—আপনাদের ভেক হয় না?

—না।

ভদ্রলোক অবাক স্বরে বললেন—কেন হয় না? এটা তো কৃত্য। সমাজে থাকলে সামাজিকতা মানতেই হয়। পৈতে হয় নি এমন ক'টা মেলে? উপনয়ন ব্রাহ্মণের গৌরব। পৈতে তারা দেবেই। আমাদেরও যখন একটা ব্যবস্থা আছে, তখন সেটা মান্য করা উচিত।

—এখানে সকলের ভেক হয়?

—হ্যাঁ, ওটা হবেই।

ওঁর স্ত্রী একগোছা রঙিন ফটো নিয়ে এলেন। ভেকের সময় তোলা। দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে সন্ন্যাসী বেশে দু'টি কিশোর।

—ছেলেদের গলায় পৈতে কেন?

জ্যোতির্ময়বাবু জানালেন—গুরুদেব বললেন, ফেলতে হবে না, থাক।

—আপনার পৈতে আছে?

—না।

—গুরুদেব কোথায় থাকেন ?

—এই পাড়াতেই।

—ভেক কে দিয়েছেন ?

—তিনিই। আমাদের আবার আত্মীয়। স্ত্রীর মামা।

—নাম কি ?

—গয়ানাথ দাস।

—তাঁর দেখা পাওয়া যাবে এখন ?

—খোঁজ নিচ্ছি।

তিনি ছেলেকে পাঠালেন। ছেলে ফিরে এসে জানাল, এক ঘণ্টা পরে দেখা করবেন।

—আপনারা সমাধি দেন ?

—এখানে সমাধি দেওয়ারই রীতি। এখন অবশ্য অনেকে মানছেন না। দাহ করছেন। সমাধি দেওয়াই প্রথা।

সমাধি ব্যাপারে আমি কৌতূহলী। মুসলমান, খ্রীস্টানের সমাধি দেখেছি। নদীয়ার চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গীতিকার ও সাধক কুবীর গোঁসাই-এর সমাধি দেখেছি। বৈষ্ণবের সমাধির আকার-প্রকার কেমন এবং মৃতদেহ সৎকার-কালে আচার-অনুষ্ঠানই বা কি হয়—সে-সব জানার ইচ্ছা জাগল। জ্যোতির্ময়বাবু বলতে পারলেন না। বললেন—বাবার মৃত্যুকালে বড্ড ছোট ছিলাম। সম্প্রতি পাড়ার একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাকে সমাধি দিয়েছে। চলুন, সে-বাড়িতে নিয়ে যাই।

বাড়িটা কাছেই। নতুন দোতলা বাড়ি। অনেক ঘর-দোর, খাট, টি. ভি. সাজানো। বাড়িতে বৈষ্ণবতা বা ধর্মকর্মের বাহ্যিক কোনো পরিচয় নেই। সদ্য বিধবা গৃহকর্ত্রীর সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি। নাকে রসকলি, হাতে জপমালা। বাড়ি ছিল রংপুর জেলায়। সমাধির কথা তুলতেই গ্রাম্য তীক্ষ্মস্বরে বলে উঠলেন—সমাধি দেওয়া দেখেন নি ?

—না। আমাদের অঞ্চলে এখন আর সমাধি দেয় না।

—তাহলে আপনারা বৈষ্ণব নন। যারা সমাধি দেয় না, তারা আবার বৈষ্ণব কিসে ?

আমি সব জানি। রংপুরের বৈষ্ণব আমরা।

সেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

গয়ানাথ দাস (মহান্ত) বৃদ্ধ। তাঁর বাড়িতে গেলাম। বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। ঘরে একখানি খাট আছে। তাতে আধশোয়া হয়ে আছেন বৃদ্ধ। লম্বা-চওড়া বিশালাকার পুরুষ ছিলেন। এখন অসুস্থ। আশি বছরের বেশি বয়স। তিনি বললেন--মৃতের সমাধি দানই আমাদের সামাজিক প্রথা।

-- কেন?

—আমরা অবৈদিক বলে। বৈষ্ণব বলে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সর্বকর্মেই বৈদিকদের অগ্নি অপরিহার্য। আমাদের সমাজে ওটা বর্জিত। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কোনো অনুষ্ঠানেই অগ্নির ব্যবহার নেই। হোমযজ্ঞ নেই। মৃতদেহকে তাই অগ্নিসাৎ করা হয় না।

জাতবৈষ্ণব-সমাজ অবৈদিক! শুনে চমক লাগল মনে।

অসুস্থ বৃদ্ধ বললেন—আর কি জানতে চান বলুন।

ইনিই জ্যোতির্ময় দাসের পুত্রদের ভেক-এর পুরোহিত। ইনি ধর্মীয় সকল অনুষ্ঠানই পরিচালনা করেন। বাবাজী নন। গৃহী মানুষ।

বললাম—ভেক সম্বন্ধে কিছু বলুন। কেন ভেক দেওয়া হয়?

বৃদ্ধ পালটা প্রশ্ন করলেন—ব্রাহ্মণের কেন উপনয়ন হয়? সব হিন্দুই দ্বিজ।

—কি রকম?

—শূদ্রের কর্ণবেধ-এর নিয়ম আছে। যাকে কানে সুতো বলে। এখন আর কেউ অনুষ্ঠান করে তা করে না। আগে জাঁক করত। এখন বিয়ের সময় কানে ছুঁচ সুতো ঠেকিয়ে দেয়। নিয়ম রক্ষে। কিন্তু ব্রাহ্মণ তার আচার ঠিক রেখেছে। আমরাও আমাদের প্রথা পালন করি। প্রত্যেকের তা করা উচিত। আপনার ভেক হয়নি?

—না।

—ভুল করেছেন। পৈতে হয় নি এমন বামুন ক'টা দেখাতে পারবেন?

—আমি ভেক সম্পর্কে জানতে চাই। আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে।

—ভেক নিতে গেলে কিছু আচার পালন করতেই হয়। যথা:

১। উপবাস, ২। মস্তক মুণ্ডন, ৩। গঙ্গাজলে স্নান, ৪। তুলসী মালা বা কণ্ঠি ধারণ, ৫। তিলকসেবা, ৬। রসকলি আঁকা, ৭। মন্ত্রজপ সর্বক্ষণ, ৮। কৌপীন বহির্বাস ধারণ, ৯। কৃষ্ণতে আত্মসমর্পণ, ১০। অনুষ্ঠানের কোনো দ্রব্য অবৈষ্ণব স্পর্শ করবে না।

ভেক-এর তিন মন্ত্র—

১। গায়ত্রী,

২। ওঁ হ্রিং ক্লীং—শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ (ডান কানে),

৩। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ (বাম কানে)।

ভেক নেবার পর কীর্তন সহযোগে মাধুকরী করবে তিন গৃহস্থদ্বারে।

—ভেক তো সন্ন্যাস গ্রহণ। তাহলে আবার গৃহস্থ হয় কিভাবে ?

—উপনয়নও তো সন্ন্যাস গ্রহণ। তারা আবার গৃহস্থ হয় কিভাবে ?

—সেটাই বলুন। শুনতে চাই।

—পুনরায় গৃহস্থ হতে গেলে সন্ন্যাসীর দণ্ড-কমণ্ডলু ও পরনের কৌপীন, মাথার বস্ত্র গুরুদেবের নামে জলে বিসর্জন দিতে হবে। সেটা করতে হবে এক রাত্রি বা তিন রাত্রি পরে। সূর্যোদয়ের পূর্বে। ব্যস, হয়ে গেলো।

—উপবীত থেকে গেলো যে ?

—রেখে দেওয়া হলো। যে রাখবে না, সে জলে বিসর্জন দেবে। আমরা তো বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব নই। জাতবৈষ্ণব। শূদ্র নই। আমাদের পুজো করার অধিকার আছে।

—সে-অধিকার তো বৈষ্ণব হলেই মেলে। বামুন-পুরুতের মতো অধিকার তো মেলে না।

—মেলে।

—দেখি নে তো।

— আমিই করি।

—কোন পুজো করেন ?

—দুর্গাপুজো করি।

—কোথায় করেন ?

—আমাদের পাড়ার বারোয়ারি পুজো তো আমিই করি।

অবাক হতে হলো শুনে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজ তাঁদের স্বার্থবিরোধী এই অনুপ্রবেশ সহ্য করেন ? বারোয়ারি পুজো মানে পল্লীর জনসমাজ স্বীকৃত।

অবশ্য এরপরেই তিনি বললেন—আমি তন্ত্রসাধক।

তবু—অব্রাহ্মণ তো !

—আপনি বিয়ে দেন ?

—দিই।

—মালাচন্দনের বিয়ে ?

—না। ওটা এখন আর চলে না।

—সে-প্রথা বিলুপ্ত ?

—প্রায়। দূর কোনো পল্লীগ্রামে হয়তো আছে।

—আপনি দেখেছেন মালাচন্দনের বিয়ে ?

—দেখেছি। আমাদের ছোটবেলায় চল ছিল।

—আপনার সেই স্মৃতিকথাটা শোনান তাহলে।

বৃদ্ধ সে-কথা শোনালেন।

মালাচন্দনের বিয়েতে আড়ম্বর কিছু ছিল না। অনুষ্ঠান নামমাত্র। একটা আসর বসত। উঠোনে কিংবা ঘরের বারান্দায়। কীর্তনের দল থাকত। তারা গাইত :

হাতে চাঁদ কপালে চাঁদ
চাঁদের উদয় হলো রে—
আমার গৌর স্বন্দর এল রে।

গয়ানাথ থামলেন। বললাম—তারপর ? পুরো গানটা বলুন।

তিনি বললেন—আর মনে পড়ছে না এখন। এই গান হতো। তখন বর আর কনে সেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের গলায় মালা পরিয়ে দিত। হয়ে যেত বিয়ে।

—কিসের মালা ? তুলসী কাঠের ?

—ফুলের মালা।

—আর কোনো অনুষ্ঠান নেই ?

—না। তবে কনে সিঁদুর পরবে না, হাতে শাঁখা পরবে না, আর মাথায় ঘোমটা দেবে না।

—সিঁদুর পরবে না কেন ?

—ওটাই বৈষ্ণবীয় রীতি। মালাচন্দনের বিয়েতে শাঁখা-সিঁদুর নিষিদ্ধ। সোনা-রূপোর গয়না যত খুশি পরতে পারে। কপালে দেবে চন্দনের টিপ, সিঁথিতে দেবে চন্দনের প্রলেপ। তাই তো মালাচন্দন নাম। আর ঘোমটা দেবে না।

—কেন ?

—কে বড় ? রাধা না কৃষ্ণ ? প্রকৃতি না পুরুষ ? বৈষ্ণব নারী পুরুষের শ্রীচরণের দাসী নয়। উভয়ের সমান মানমর্যাদা। সখা-সখী, প্রেমিক-প্রেমিকা। বৈষ্ণবের স্ত্রী স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করবে না।

মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আমার ভাগ্নী ছিল। তাকে দেখিয়ে গয়ানাথ বললেন—এর মেজ ঠাকমা, আমার জেঠতুত বোন, তার মালাচন্দনে বিয়ে হয়েছিল। আমরা তখন খুব ছোট। আবছা মনে পড়ে।

—জাতবৈষ্ণবের কি বিধবাবিবাহ সিদ্ধ?

—হ্যাঁ, সিদ্ধ।

—গৃহীদের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না তো!

—হ্যাঁ। ভদ্র গৃহস্থ সমাজে এর চল নেই। আগে গ্রামে-ঘরে হতো। তবে এসব আখড়াতেই হতো। আর বিধবাদের বিয়ে মালাচন্দনেই হয়। সামাজিকভাবে, পারিবারিক যোগাযোগে তো এ বিয়ে হয় না। অধিকাংশই ভালবাসার বিয়ে।

—মৃত্যু হলে কি সমাধি দেওয়াই রীতি?

—হ্যাঁ, ইংরেজি 'এল্' অক্ষরের আকারে গর্ত খুঁড়ে কোণের দিকে নিয়ে গিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় সমাধি দেওয়া হয়।

—তখন অনুষ্ঠান কি হয়?

—অনুষ্ঠান আর কি? শবদেহকে স্নান করিয়ে, তিলকসেবা করিয়ে হাতে জপমালা দিয়ে দেওয়া হয়। গর্তে শবদেহ বসিয়ে মাথায় তুলসীপাতা দিয়ে, তার ওপর লবণ দিয়ে মাটি চাপা দেয়।

—শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান কি?

—এসব বিষয়ে বই পাওয়া যায়। ভেক সমাধি ভেকাশ্রিত তত্ত্ব, বৈষ্ণবের করণীয়—কেন, কোথা থেকে উদ্ভব—সব লেখা আছে, পড়ে নেবেন।

—আপনারা কি করেন, সেটাই জানতে চাই।

—মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা তিনদিন অশৌচ পালন করবে, হবিষ্যি করবে। চতুর্থ দিনে মহাপ্রভুর ভোগ আর কীর্তন দিয়ে অশৌচমুক্তি।

—এখন যে দশদিন অশৌচ পালন করে?

—করলে আর কে ঠেকাবে? জাতধর্ম জেনে বুঝে আর ক'জন কাজ করে? বামুনদের দেখে করে। সবাই বামুন হতে চায়। তাহলে আর বৈষ্ণব-জাতে ঢুকলি কেন?

—কেন ঢুকেছিল?

—বামুনদের তাড়া খেয়ে। বামুনরা 'দূর, ছেই' করছিল। তখন মহাপ্রভুর আশ্রয়ে ঢুকে পড়ল।

গয়ানাথের কথা শুনতে শুনতে মনে প্রশ্ন জাগল, নিখাদ মৌলিক ধর্ম কি

আছে, যা অন্য কারও দ্বারা কোথাও কোনভাবেই প্রভাবিত নয়? তা কি সম্ভব? জাতবৈষ্ণব-সমাজের আচার-বিচার অনুষ্ঠানাদির ভিতরে বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, সুফী, এমন কি ইসলামের প্রভাবও হয়তো মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। অস্বাভাবিক নয় এই কারণে যে এই সমাজ একটি জনমিশ্রণ-সম্ভব। শ্যামাদাস মহান্ত বলেছিলেন, শুনেছি, জাতবৈষ্ণব-সমাজে প্রথমে অশৌচ বলে কিছুই ছিল না। পণ্ডিত সমাজের কারও কারও মতে, জৈনদের সমাধি-রীতির অনুকরণে বৈষ্ণবদের এই উপবিষ্টভাবে সমাধি দেওয়ার রীতি প্রচলিত। দক্ষিণ দিনাজপুরের লস্করহাট-এর কাছে 'পারালি' গ্রামের অধিবাসী রঞ্জিত মহান্ত একজন সরকারী কর্মচারী। তিনি বলেছিলেন যে তাঁরা অশৌচকালে কাছা পরেন না, ধুতি পরে থাকেন এবং হবিষ্যান্ন আহার করেন না। একবেলা আতপ চালের ভাত খান। অবশ্য অশৌচ পালন করেন দশদিন।

অর্থাৎ অঞ্চল-ভেদে রীতি ভিন্ন।

গয়ানাথ বললেন—আর কি জানতে চান?

—আপনারা কতকাল বাস করছেন এখানে?

—সে তো বহুকাল হলো। আদিপুরুষ বৃন্দাবন থেকে এখানে এসেছিলেন। তখন তিনি সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। সঙ্গে আর একজন ছিলেন। বৈদ্য। এখানে তখন মানুষের বসতি ছিল না। ঘন বাঁশবন ছিল। বাঘ থাকত। তার ভিতরেই তিনি আশ্রম খুলেছিলেন। বাঁশবন ছিল বলেই জায়গার নাম বাঁশবাড়ি। বৈদ্যের খবর আর জানি নে। শুনেছি, তিনি আবার বৃন্দাবন ফিরে গিয়েছিলেন। আর ইনি শেষে গৃহী হয়েছিলেন। এসবই আমার শোনা কথা। সাতপুরুষের নাম বলতে পারি।

—জাতবৈষ্ণব-সমাজে তাহলে অনেক ব্রাহ্মণও এসেছেন!

—অনেক—অনেক। আমাদের কথা ছেড়েই দিন। অভিরামপুরের ললিত মজুমদার—ব্রাহ্মণ। স্ত্রীর মৃত্যু হলো। শোক হলো খুব। তখন সপরিবারে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হলেন। আপনার বোনের পরিবার—ওরাও ব্রাহ্মণ থেকে বৈষ্ণব। এখানে আর একটি পরিবার আছে। চক্রবর্তী ছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণ। এখন অধিকারী। জাতবৈষ্ণব। আমাদেরই আত্মীয় এখন। বিয়ে-থা হয়েছে এই জ্যোতির্ময়দের পরিবারে। তারা গুরুগিরিও করে।

—বৈষ্ণবদের তো অনেক শাখা। অঞ্চল-ভেদে গুরু-ভেদে। এখানে কার প্রভাব বেশি?

—তা বলতে পারব না। তবে আমরা হলাম আউলে।

—কি বললেন ?

—আউলিয়া বৈষ্ণব।

এবার ক্লান্তভাবে তিনি শুয়ে পড়লেন। আর ব্যাখ্যা শোনা গেলো না।

ভাগ্নী বাড়ি গিয়ে তার মেজ ঠাকমাকে মালাচন্দনের বিয়ের কথা বলতেই তিনি উত্তেজিত হলেন। আমার কাছে এসে বললেন—আমার মালাচন্দনে বিয়ে হয় নি। গয়ানাথ মিথ্যে বলেছে। শত্তুর। আমার বাবার কত পয়সা—একটা মাত্তর মেয়ে, বিয়েতে কত জাঁক হয়েছিল।

বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার ডাকতে হলো।

গৃহস্থ জাতবৈষ্ণব পরিবারে মালাচন্দনে বিয়ে আজ অপমানসূচক।

॥ আট ॥

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে অনেক ক'টি বৈষ্ণবপল্লী আছে। তার ভেতর কাঁঠালপোতা, ষষ্ঠীতলা, কদমতলা প্রধান। আমাদের এক আত্মীয় যুবকের কাঁঠালপোতায় বিয়ে হয়েছিল। তখন আমি কিশোর। এসব বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। শুনেছিলাম, তাঁর মালাচন্দনে বিয়ে হয়েছিল। তা শুনে মার কি হাসি। কেত্তন গেয়ে খোল বাজিয়ে বিয়ে—ছোঁড়ার লজ্জা করল না ?

এখন কাঁঠালপোতার এক ভদ্রলোককে চিনি যিনি বৈষ্ণবসমাজে পুরোহিতের কাজকর্ম করেন। তিনি একদিন আক্ষেপের সুরে বললেন, সে-সব দিন আর নেই। শিক্ষিত সমাজ লজ্জা পায়। বামুন পুরুত সব দখল করে নিচ্ছে। ইনি আমাদের সেই আত্মীয়কে চেনেন যাঁর মালাচন্দনে বিয়ে হয়েছিল। বললেন, ওঁর শ্বশুরবাড়ি শেষ অবধি সামাজিক প্রথা মেনে চলতেন। তাঁদের আদি নিবাস তো বীরভূম। সেখানকার সমাজে বাঁধন বেশি। উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এখনও ধর্মের মধ্যে আছে। নদীয়াই হতচ্ছাড়া।

শেষ অবধি বাঁকুড়াতে গিয়ে মালাচন্দনে বিয়ের একটা নজির মিলে গেলো। বাঁকুড়ার সোনামুখী পেরিয়ে পাত্রসায়রের কাছে কাকাটিয়া গ্রাম। সেখানে এখন একটিমাত্র জাতবৈষ্ণব পরিবার আছে। মাটির বাড়ি, খড়ো চাল। জমিজমা চাষবাস কিছু আছে। গৃহস্বামী প্রয়াত। সরকারি চাকরি করতেন। তাঁর ভাই

আছেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। বাড়ির ছেলেরা কেউ শিক্ষক, কেউ অধ্যাপক, কেউ প্যারিসে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী। তাঁদের বৃদ্ধা মা হাতে জপমালা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—আমার মালাচন্দনে বিয়ে হয়েছিল। আমার বাপের বাড়ি রাণীগঞ্জ শহরে। বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল দশ কি এগারো।

—কি হয়েছিল—শুধু মালা-বদল ?

—হ্যাঁ।

—আর কীর্তন ?

—হ্যাঁ।

—শাঁখা-সিঁদুর পরেছিলেন ?

—না।

—ঘোমটা দিয়েছিলেন ?

—তা মনে নেই। তবে অনেক নিষেধ ছিল। মনে খুব সাধ ছিল নূপুর পরার। কিন্তু পরা যেত না।

—কেন ?

—শ্রীরাধা নূপুর পরেন। তাঁর পায়ে নূপুর আছে। সেই নূপুর কি বৈষ্ণব পরতে পারে ?

তথ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'মঞ্জুরি' সাধনা করেন। মেদিনীপুরের বৈষ্ণব গুরু শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে শ্রীরাধার চরণের একটি হারানো নূপুর উদ্ধার করেছিলেন। কনক মঞ্জরী। তাই তাঁর সম্প্রদায়ের তিলক-সেবায় নূপুর চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। মেদিনীপুর সংলগ্ন বাঁকুড়ার এই অঞ্চল হয়তো শ্যামানন্দ প্রভাবিত। তিলকসেবায় নূপুর অঙ্কিত। তাই বৈষ্ণব পরিবারের বধূ নূপুর পরবেন কেমন করে ? সম্ভবত এটাই কারণ।

এই বাড়িতে সমাধিও দেখা গেলো, বাড়ির উঠোনেই। নিচু, ছোট, গোলাকার। মনে হলো, কুয়োর মতো গর্ত করে সমাধি দেওয়া হয়। বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূমে সমাধি দেওয়াই রীতি। গ্রামাঞ্চলে সমাধি দেওয়া হয় বাড়িতেই।

বাঁকুড়া শহরের এক ভদ্রলোক বলছিলেন—আমাদেরই মুশকিল। সমাধি দিই নদীর ধারে। এখন মিউনিসিপ্যালিটি অনুমতি দিতে চায় না। কাঁচা সমাধি নদীর বন্যায় ধুয়ে যায়। কতকাল আর এভাবে দেওয়া যাবে ?

বললাম—দাহ প্রথা চালু করুন। সমস্যা চুকে যাবে।

তিনি বললেন—ধর্মীয় প্রথা কি ইচ্ছে করলেই পরিবর্তন করা যায়? হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কেউ প্রথার বাইরে যায় না।

বললাম—কথা ঠিকই। কিন্তু আমরা ব্যতিক্রম হবার নজির হয়েছি। আপনাদের মধ্যে থেকেও যেন নেই।

তিনি হেসে বললেন—না ঘর কা না ঘাট কা। সবাই তো পারে না।

ভগ্নীপতি ডঃ দাস, কলকাতায় সল্টলেক নিবাসী। বাঁকুড়ার মানুষ। তাঁদের ভিতর এখন আভিজাত্য অনুপ্রবিষ্ট। মেয়ে অস্ট্রেলিয়াবাসিনী, ছেলে আমেরিকায়।

সেই ভগ্নীপতির চিঠি এল, মা পরলোকগমন করেছেন। পারলৌকিক অনুষ্ঠানে আসুন। নিমন্ত্রণ-পত্রে শ্রাদ্ধ শব্দটির উল্লেখ নেই।

মনে কৌতুহল ছিল। কলকাতার অভিজাত পরিবেশে ওঁরা কি ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করছেন দেখতে হবে।

গিয়ে দেখা গেলো, ঘরের ভিতর চৈতন্যপুজো হচ্ছে, ভোগরাগের আয়োজন হয়েছে। বাইরে বারান্দায় ফরাসের ওপর বসেছে কীর্তনের আসর। নিমন্ত্রিত অতিথিরা বসে কীর্তন শুনছেন। পুজো শেষ হলো। প্রসাদ খেয়ে অশৌচমুক্তি ঘটল। তারপর শুরু হলো নিমন্ত্রিতদের ভোজন পর্ব।

রাত্রিবেলা ভগ্নীপতি বললেন—বড়দা, কেমন হলো?

—ভালোই তো হলো।

—মনে প্রথমে দ্বিধা ছিল। কে কি ভাববে, হাসাহাসি করবে। তারপর মনে হলো, সবাই তো নিজের মতো চলে। আমিই বা আমার মতো চলব না কেন? পুরুতটা বামুন। বলল, আমি মালসাভোগ দিতে পারি। আমরা বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত। কাজটা আমাকে দিয়েই করান। বললাম, করো। বৈষ্ণব বাবাজী এখন কোথায় খুঁজব? মাকে ইলেকট্রিক চুল্লিতেই দিলাম। বাবার সমাধি আছে গ্রামের বাড়িতে।

পাশে বসে ছিল ওঁর ভাই চণ্ডী। সে বলল—মার অস্থি গঙ্গায় দিইনি। এনে রেখেছি। গ্রামে নিয়ে গিয়ে বাবার পাশে সমাধি দেবো।

শেষে অস্থি নিয়েই গোলমাল বাধল। মহিলা মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। তারা ভূত দেখতে লাগল, অন্ধকারে নাকি প্রেতাত্মা এসে দাঁড়াচ্ছে তাদের সামনে।

আমার বোন ধমক দিলো চণ্ডীকে—অস্থি তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও।

চণ্ডী ওখানেই একটা ফ্ল্যাট কিনে বাস করে। অস্থি সেখানে নিয়ে গেলো না

সে। সম্ভবত ভূতের ভয়ে এবং স্ত্রীর ভয়ে। অস্থি নিয়ে সে গ্রামের বাড়িতে চলে গেলো।

ভূত দেখা গেলে হিন্দু-বিশ্বাসমতে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করতে হবে। তাহলে প্রেতাত্মার গতি হয়ে যায়। কিন্তু জাতবৈষ্ণবের পিণ্ডদান নিষিদ্ধ। তাদের তো প্রেতলোকে আস্থা নেই। তাদের পরজন্ম আছে, পরকাল নেই। ইহকালই সব। আর আছে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনা।

আমার ভেক হয় নি। বৈষ্ণবীয় আচার-অনুষ্ঠানও নেই। তবু গয়া ভ্রমণে যাবার আগে মা পই পই করে বলে দিলেন—গয়ায় গিয়ে যেন তোমার বাবার নামে পিণ্ড দিও না।

গয়ায় ফল্গু নদীতীরে বিষ্ণুপাদপদ্ম। পিতার পিণ্ডদানের জন্য গৌরাঙ্গদেব গয়ায় গিয়ে সেই বিষ্ণুপাদপদ্মের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং তাঁর ভাবান্তর ঘটেছিল।

আমিও সেখানে পাদপদ্মের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কতজন সেখানে পিণ্ডদান-কর্মে ব্যস্ত। আমার সঙ্গী বন্ধু তাঁর পিতার পিণ্ডদান করলেন।

আমি দর্শক মাত্র। আমি জাতবৈষ্ণব। আমাদের প্রেতাত্মা নেই, প্রেতলোক নেই। এই জীবন আর এই পৃথিবীই সত্য। আর ঈশ্বর।

তৃতীয় পর্ব

আখড়া আছে। বাবাজীরাও আছেন। তাঁদের কার্যকলাপের নমুনাও মিলে যায় মাঝে মাঝে। নন্দ বসাক নিমন্ত্রণ করে গেলো। তার বড়মা-র পারলৌকিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। পাড়ার লোকের নিমন্ত্রণ—যেতেই হয়।

বড়মা বলতে জ্যাঠামশায়ের স্ত্রী। ওঁরা তন্তুবায়। জ্যাঠামশায় ছিলেন বৈষ্ণব। তিনি যৌবনকালে এক বিধবা রমণীকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধবেন না। হিন্দুমতে বিধবাকে বিয়ে করলে লোকে খুব নিন্দে করবে। একঘরে করবে। রক্ষিতা করে রাখলে সমাজ বাধা দেবে না। কিন্তু ভালবাসার জনকে রক্ষিতা করে রাখতে মন চায় না। নিজেরও তাতে অখ্যাতি বাড়বে বৈ কমবে না। আর সে তো দুধের সাধ ঘোলে মিটানো। অতএব তাঁরা শেষ পর্যন্ত বাবাজীর আখড়ায় গিয়ে ভেক নিয়ে মালাচন্দন করলেন। বড়মার পূর্বস্বামীর একটি কন্যা ছিল। তাকেও ভেক দিয়ে বৈষ্ণবী করে নিলেন।

নন্দ বসাকের বাবার বিয়ে হয়েছিল আগেই। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলো অকালে। অতি নাবালক একটি ছেলে আর একটি মেয়ে রেখে। নন্দর মা বিধবা হলো। কাঁচা বয়স। ক'মাস পরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো কোনো এক পুরুষের সঙ্গে। ছেলে আর মেয়েকে ফেলে রেখে। ছেলেমেয়ে পড়ে থাকল অনাথ শিশু হয়ে। সেই দুর্দিনে বড়মা তাদের কোলে তুলে নিয়েছিলেন। লালন করেছেন সন্তানবৎ। নন্দর বোনের ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে। নন্দ লেখাপড়া শিখেছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভালো পরিবারে বিয়ে হয়েছে। ধনে-জনে পরিপূর্ণ তার সংসার। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু আগেই হয়েছে। এখন বড়মা গেলেন। নন্দ তার বড়মাকে খুব যত্নে রেখেছিল। পাড়ার লোকে বলাবলি করত—দেখো, নিজের কেউ না, নিজের জাতেরও না, তবু বড়মা বলে কত সম্মান খাতির করে নন্দ। বড়মা অসুখে পড়ল। ডাক্তার-বদ্যি-চিকিৎসা, কি খরচাই না করল। লোকে আপন মাকেও অমন করে না।

নন্দ এখন জাঁক করে বড়মার পারলৌকিকক্রিয়া সম্পন্ন করছে। সেই কীর্তন আর মালসাভোগের আয়োজন। নন্দ বলল—দাদা, বৈষ্ণব মহান্ত দিয়েই বড়মার কাজ সারলাম।

—ভালোই করলে।

—কিন্তু দাদা, মাথার ওপর অভিভাবক বলতে আর কেউ থাকল না। 'নন্দ' বলে কেউ আর হাঁক দেবে না। নন্দর গলা ভারি হয়ে উঠল।

বড়মার নিজের মেয়ের বিয়ে হয়েছে জাতবৈষ্ণবের ঘরে। সেই মেয়ে-জামাইও এসেছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে। জামাই সরকারি অফিসের কর্মী। তাদের ছেলেমেয়ে কলেজে পড়ে। আলাপ হলো। তাদের কথায়, কি আচরণে, কোথাও হীনমন্য ভাব লক্ষ্য করা গেলো না। খুবই সহজ স্বাভাবিক পরিবেশ। ফিরে আসার সময় বার বার মনে পড়তে লাগল নন্দর হারিয়ে যাওয়া নিজের মা বড়মাকে। মালাচন্দনের বিয়ে আখড়ার বাবাজীকে।

এক বন্ধু একটি ঘটনা শোনালেন।

পাড়ায় মচ্ছব লেগেছে। প্রতি বছরই হয়। কিছু ব্যবসাদার আর পাড়ার ধর্মকর্মের লোক মিলে ওটা করে। দু'দিন খুব হৈচৈ হয়। পাড়ার কিছু লোক খুব মাতামাতি করে। কোথা থেকে সব বাবাজী বোষ্টম এসে হাজির হয়। মাঝে মাঝে মজা দেখতে যাই। এবারও গেলাম। গিয়ে একটা দৃশ্য দেখে অবাক হলাম। আমাদের ঝড়ু ওর মধ্যে ঢুকে অমন নাচছে আর গান গাইছে যে? আবার পটেশ্বরীও জুটেছে? সেও বৈষ্ণবী সেজে নাচগান করছে! ঝড়ুকে যে আমি বহুকাল থেকে জানি। ভোজের বাড়িতে রাঁধুনি বামুনের পেটেল হয়ে খাটত। কি জাত কে জানে। উঁচু-টুঁচু নয়। আর ওর গুণেরও শেষ নেই। গাঁজাখোর, মাতাল—আর দুষ্কর্ম কি না করে। পাড়ার চিহ্নিত নোংরা। আর পটেশ্বরী প্রথম জীবনে ছিল পতিতা। তারপর লোকের বাড়ির ঝি। ওটাও পাড়ার চিহ্নিত মেয়েমানুষ। তাদের হঠাৎ এমন ধর্মে মতি হলো কেন? পাড়ার লোককে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা এর মধ্যে কেন? পাড়ার লোক বলল, ওদের ধর্মে মতি হয়েছে। ওরা দু'জনে বাবাজীর কাছে ভেক নিয়ে বোষ্টম হয়েছে। আবার মালাচন্দন না কি করে যেন বিয়েও করেছে দু'জনে। নাকি এক জায়গায় থাকে। শুনে আমি বলে উঠলাম, জয় গোঁসাই বাবাজী! বলিহারি তোমার বোষ্টম জাত। সাধে কি লোকে বোষ্টম জাতকে ঘেন্না করে! এদের নিয়েই তো বোষ্টম জাত পুষ্ট হয়েছে। আবার এদের সন্তান হলে তারা হবে কুলীন বোষ্টম।

বললাম—মানুষের কি মন্দ থেকে ভাল হবার, অসামাজিক থেকে সামাজিক হবার, অমানুষ থেকে মানুষ হতে চাওয়ার অধিকার নেই?

বন্ধু বললেন—চাইলেই কি পাওয়া যায় ? যোগ্যতার প্রশ্ন আছে। ওরা কি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে ?

তর্ক করে লাভ নেই।

মনে পড়ল এই শহরেরই একটি পরিচিত পরিবারকে। রাম আর লক্ষ্মণ—দু' ভাই। ব্রাহ্মণ। উপবীতধারী। বাবা বিহারী ব্রাহ্মণ। পাচক ছিল কোনো বাড়িতে। মা এদেশীয় নিম্নবর্ণের মহিলা। পরিচারিকার কাজ করত কোথাও। তাদেরই সন্তান ওরা। যাকে বলে, অবৈধ, জারজ। রামচন্দ্র নবদ্বীপের একটি জারজ কন্যাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু লক্ষ্মণ বিয়ে করেছে পাকা ব্রাহ্মণ পরিবারে। সামাজিক ভাবেই। ওদের সন্তানরা সগৌরবে ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত হয়ে যাবে। আবহমানকাল থেকে সমাজ তো এভাবেই পুষ্ট হচ্ছে। কোথাও আলোয় এসে প্রকাশ্যে, কোথাও গোপনে অন্ধকারে।

আমার এক বন্ধু একটি বনেদি জাতবৈষ্ণব পরিবারের ছেলে। গ্রামের বুকে তাদের পারিবারিক মান-সম্মান অনেক। সবাই খাতির করে। সেই বন্ধু বিয়ে করে বসল একটি জারজ কন্যাকে। ভালবেসে নয়, সামাজিক ভাবেই।

মেয়েটি অন্য গ্রামের। সে-গ্রামের এক বিত্তবান ব্রাহ্মণ, সংসারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা থাকা সত্ত্বেও একটি বিধবা বেনের মেয়েকে রক্ষিতা করে। রক্ষিতার গর্ভে পুত্রকন্যা জন্মায়। এরা অবৈধ। হিন্দুসমাজের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটলেও, সমাজ তাদের আশ্রয় দেবে না। অতএব মা ছেলেমেয়ে নিয়ে বাবাজীর শরণাপন্ন হলো। বাবাজী ভেক দিয়ে তাদের বৈষ্ণব করে দিলো। সেই কন্যাকে বিয়ে করল আমার বন্ধু। বউ নিয়ে বাড়ি এল। প্রতিবেশিনীরা ছুটে এল মজা দেখতে। কি হাসাহাসি আর বিরূপ মন্তব্য। বন্ধুর মা গম্ভীর অথচ সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে বধূবরণ করে নিলেন। তারপর প্রতিবেশিনীদের উদ্দেশ করে বললেন—আমরা হলাম বোষ্টম জাত। মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত। আমরা নীলকণ্ঠ। বিষ হজম করতে পারি।

রক্ষিতা মহিলার ছেলেকেও বৈষ্ণব পরিবারেই বিয়ে করতে হতো। কিন্তু এখন যুগ পরিবর্তিত। তাই রক্ষিতার ছেলে বৈষ্ণবতা মানল না। বিদ্রোহ করল। কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করে পিতার পদবি নিয়ে নিল। কোথায় কোন এক মন্দিরে গিয়ে উপনয়ন সেরে পৈতে ধারণ করল। তারপর যথারীতি একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের জামাই হয়ে গেলো। সেই বন্ধুর ছেলে এখন আমাকে শোনায়—জানো, আমরা বোষ্টম, আমার মামা বামুন। গলায় মোটা পৈতে।

আমি হাসি আর মনে মনে ভাবি—সমাজ তো এভাবেই এগোচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা—যুগযুগ ধাবিত যাত্রী।

আর এক বাল্যবন্ধু শিবু পাল—কুম্ভকার ওরা। অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী। সে একদিন বলল—শোনো এক কাণ্ড কথা। আমার ভাগ্নে, আমারই বয়সী, গ্রামে থাকে। শুনলাম, সে সপরিবার ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছে। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছে তোমাদের সমাজে।

বন্ধু হেসে জিজ্ঞেস করল—কেন এমন করেছে জানো?

—কেন?

—স্রেফ ধান্ধাবাজি। তার গুরু এক আখড়াধারী বাবাজী। আখড়ার বিষয়-সম্পত্তি অনেক। বাবাজী মারা গেলো। এখন সে আখড়ার বাবাজী হয়ে বসে সম্পত্তি ভোগ-দখল করছে। আগে সে সংসার ছেড়ে একা এসে বাবাজীর কাছে থাকত। তাই বাবাজী তাকেই পরবর্তী বাবাজী মনোনীত করে গেছে। তারপর সে বাবাজী হয়েই বউ-ছেলেকে আখড়ায় নিয়ে এসেছে। আগে টালির ব্যবসা ছিল। এখন সে-সব আর করে না। করার দরকার হয় না।

হেসে বললাম—লোকে এই বোষ্টমদের গালমন্দও করে প্রাণ খুলে।

"চেটাস্তি পেটাস্তি মালা টেপা উদাসিনী
মাগ-হারা যমে পোড়া
এরাই ছ'জন বোষ্টমের গোড়া।

এখানে চেটাস্তি মানে নারী লোলুপ, পেটাস্তি মানে ভোজন সর্বস্ব। মালা টেপা বলতে তাদের বোঝায় যারা কেবল মালা জপে। উদাসিনী মানে গাঁজাখোর উদাস স্বভাবী। মাগ-হারা মানে বিপত্নীক বা যার পত্নী চলে গেছে। যমে পোড়া কথাটির অর্থ আরও মর্মান্তিক অর্থাৎ যমেও ছোঁয়না যাকে। এই মর্মান্তিক রচনায় ঝরে পড়ছে ভ্রষ্ট বৈষ্ণবদের বিষয়ে হাড়ীরামীদের প্রচণ্ড ঘৃণা।"
(সুধীর চক্রবর্তী: বলাহাড়ী সম্প্রদায় আর তাদের গান)।

অন্যরাও বলেছে:

বাহিরে জানাও সব ধার্মিকের ভাব।
রসকলি নাসিকায় দেহময় ছাপ ॥
ত্বকের ভিতরে ঠক ঠকের প্রধান।
বাহিরে ধর্মের ভাব বকের সমান ॥ (ঐ)।

বন্ধু শুনে হেসে বলল—ভাগ্নেও একটা যুবতী সেবাদাসী জুটিয়েছে শুনলাম। আখড়াতেই থাকে। সংসারের মধ্যেই। নাকি সাধন-সঙ্গিনী।

বল্লাল সেনকে মনে পড়ল। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গীতিকার কুবীর গোঁসাই-এর সমাধির পাশে দেখেছি তাঁর স্ত্রী এবং সাধন-সঙ্গিনীর সমাধি। বলরাম চন্দ হাড়ী ছিলেন অবিবাহিত। ব্রহ্ম মালোনি ছিলেন তাঁর সাধন-সঙ্গিনী। উড়িষ্যার রায় রামানন্দেরও সাধন-সঙ্গিনী ছিল। তান্ত্রিকতায় যৌন-যোগাচার গুহ্য সাধনা। সেই ধারা আজও প্রবহমান। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ এই আচারকে পরিহার করারই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এই আখড়াধারী বৈষ্ণবদের কথা ভেবেই।

সেবাদাসী বা সাধন-সঙ্গিনী সরবরাহ করে কোন সমাজ? সভ্যতার এত অগ্রগতি, রুচিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজের এত তৎপরতা সত্ত্বেও এই নারী সরবরাহ স্রোতের ধারা শুকিয়ে গেলো না?

শিবু পাল বলল—পতিতা বৃত্তি উঠে গিয়েছে দেশ থেকে? সে আশ্রয়গুলো ভরে রাখে কোন সমাজের মেয়েরা এসে? তাদের ভরণ-পোষণ চালায় কারা? নিশ্চয়ই গ্রাম্য বাবাজীরা নয়।

—তা বলে বাবাজীদের ও সব কাজকর্ম কি সমর্থন করা যায়?

—তা অবশ্য করা যায় না। আমার ভাগ্নে বসে অপরাধী নয়, তা বলব না। বন্ধু শিবু পাল চুপ করে গেলো।

কিন্তু কবি নাট্যকার বন্ধু রবি বিশ্বাস বললেন—গ্রামের আখড়া আর সেখানকার গোঁসাই বাবাজীদের সম্পর্কে ঠিক এই রকম মানসিকতা থাকা ঠিক নয়। এটা অনেকটাই শোনা কথা নির্ভর। পরের মুখে ঝাল খাওয়া। অজ্ঞতাপ্রসূত।

—কি রকম?

—আখড়ার বাবাজী গোঁসাই মাত্রই যৌন-যোগাচারী হবেই, এমন কি কথা আছে? সেবাদাসী থাকলেই তার ওই একটি মাত্রই উদ্দেশ্য থাকতে হবে, তার মানে কি? আর বাবাজী গোঁসাই মানেই কি লম্পট-শিরোমণি? তাদের কাজের মধ্যে দুই—খাই আর শুই? ভিক্ষে করে আনবে আর তারপর আহার-নিদ্রা-মৈথুন-সর্বস্বতা? তা কি হয়? তাহলে যুগ যুগ ধরে কি তারা টিকতে পারে? যে কিছুই দেয় না, সে পায়ও না কিছু, টেকেও না। বিশেষ করে গ্রাম-সমাজের মানুষের এসব বিষয়ে সচেতনতা সতর্কতা অনেক বেশি। আর সমালোচনা, গাল-মন্দ তো প্রতিপক্ষীয় ব্যাপার। অর্থাৎ আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই, গাঁয়ে-ঘরে এই সব গোঁসাই বাবাজীদের অবদান অনেক—বিচিত্র। হঠাৎ দেখে তা

বোঝা যায় না। অনুভব করতে হয়। অনেকটাই সাংস্কৃতিক জগতের ব্যাপার। আমার অভিজ্ঞতার কথাই শোনাচ্ছি—

আমাদের অঞ্চলে অর্থাৎ আমাদের হাঁসখালি থানা অঞ্চলে একজন গোঁসাই ঠাকুর ছিলেন। তাঁর একটা আখড়া ছিল। তিনি সেই আখড়াতেই থাকতেন। আমাদের কালে অর্থাৎ আমরা যখন বালক, তখনই তিনি প্রায় বৃদ্ধ। কালো, লম্বা, মাথায় বড় বড় চুল, টিকাল নাক, বড় বড় চোখ। রাশভারি গম্ভীর মূর্তি। শুনতাম, খুব জ্ঞানী মানুষ, তত্ত্বজ্ঞান অনেক। তাঁর শিষ্যবর্গ ছিল অনেক, নানা গাঁয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। হয়তো দূরেও শিষ্য ছিল। তিনি সপ্তাহে একদিন ভিক্ষায় বার হতেন করতাল বাজিয়ে কীর্তন গাইতে গাইতে। গৃহস্থের দরজায় দরজায় ঘুরতেন। লোকে খুব খাতির করে ভিক্ষা দিত। বলত, গোঁসাই ঠাকুর এয়েচেন। ভিক্ষা ছিল তাঁর ধর্মীয় রীতি পালন। ভিক্ষা তাঁর প্রয়োজনীয় ছিল না। শিষ্যরাই তাঁর সংসার চালাত। তিনি সাধন-ভজন করতেন। আর তিনি ছিলেন বহুজনের সঙ্গীত-শিক্ষাগুরু। সন্ধ্যায় তাঁর আখড়া মানুষে ভরে থাকত। তিনি তাদের গানের তালিম দিতেন।

এই গোঁসাই ঠাকুরের দু'জন সেবাদাসী ছিল। একজনের ছিল একটি ছেলে। আরেক জনের ছিল একটি মেয়ে। ছেলেটি গোঁসাই ঠাকুরের নয়। মহিলা ছেলেটিকে কোলে নিয়েই গোঁসাই ঠাকুরের আখড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। হয়তো ছেলেটি জারজ। আর মেয়েটি কার তা কে জানে। গোঁসাই ঠাকুরেরও হতে পারে। তা নিয়ে গাঁয়ের কেউ মাথা ঘামাত না। সেবাদাসী দু'জনও সপ্তাহে একদিন ভিক্ষায় বার হতো।

আর সেই ছেলেটির কথাই বেশি মনে পড়ে। কালো, রোগা। পেট ডাগরা— আমাদেরই বয়সী। আমাদের বয়স যখন দশ-বারো বছর, তখন তারও সেই বয়স। আমরা স্কুলে যেতাম, সে তখন ভিক্ষায় বার হতো। তার নাম কি ছিল কে জানে, লোকে বলত খ্যাপা চাঁদ। আমরাও বলতাম খ্যাপা চাঁদ বৈরাগী। সে পথ দিয়ে যেত, আমরা তাকিয়ে দেখতাম। নাকে রসকলি, গায়ে তিলকচর্চা, গলায় কণ্ঠি, পরনে বহির্বাস, হাতে একতারা, গলায় ঝোলানো ঝুলী। এই অদ্ভুত রূপ বলে আমরা খুব আকর্ষণ বোধ করতাম। খ্যাপা চাঁদ ছোড়া অমন কেন? অভিভাবক-দের কাছ থেকে উত্তর মিলত, ওরা যে বোষ্টম। আমাদের মতো নয়। আখড়ায় থাকে, আমাদের মতো গেরস্থ বাড়িতে থাকে না। ওদের কাজই হলো, লোকের বাড়ি গান গেয়ে ভিক্ষে করা। জিজ্ঞেস করতাম—গান গেয়ে ভিক্ষে করে কেন?

অভিভাবকেরা বলতেন—ওরা ওদের ধর্মের গান গায়। লোককে শোনায়। খালি হাতে, 'ভিক্ষে দাও গো' বললে লোকে রেগে যায়। কিন্তু গান শোনালে মন ভালো হয় লোকের। সারা জীবন গান গেয়ে ভিক্ষে করেই ওদের পেটের ভাত করতে হয়। তাই ওরা গানটা শেখে। আখড়ার গোঁসাই গানটা শিখিয়ে দেয় ভালো করে, বাস, জীবনভর আর ভাতের ভাবনা নেই। তারপর ধম্মকম্ম যে যেমন পারে।

তা আমাদের খ্যাপাচাঁদ গানটা শিখেছে খুব ভালো। গলা কি, যেন বাঁশি। পেট ডাগরা ছোঁড়া যখন গান ধরে—হ্যাঁ, শোনবার মতো। সে তখন একেবারে অন্য মানুষ। আমরা তার পিছন পিছন ছুটতে চাইতাম—গান শোনার জন্য। কিন্তু আমাদের স্কুল আছে, পড়া আছে, খেলাধুলো আছে। আর ও তো ভিখিরি। গান গেয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়ায়। আমার দিদিমা ছিলেন বুড়ো মানুষ। খুব ভক্ত। তাঁর বাড়িতে খ্যাপাচাঁদ খুব যেত। আর সে গেলেই দিদিমা বলতেন, খ্যাপা' এইচিস! আয়—দু'খানা গান শোনা দেখি।

খ্যাপাচাঁদ অমনি গান ধরে দিলো। গান শেষ হলে দিদিমা অমনি চাল, আনাজ, যা থাকত, খ্যাপাচাঁদের ঝুলিতে দিতেন। খ্যাপাচাঁদের জন্য দিদিমার আধ সের চাল বরাদ্দ ছিল।

দিদিমা বলতেন, হ্যাঁরে খ্যাপা, তুই কখন গান শিখিস?

খ্যাপাচাঁদ বলত, সন্ধ্যে বেলা। গুঁসাই শিখায়। আরও কত লোক আসে—গুঁসাই-এর শিষ্য। সবাইকে নিয়ে গুঁসাই-এর গানের আসর বসে। তখন গান শুনি, আর শিখে নিই। গুঁসাই আমাকে আলাদা করেও শিখায়। বলে, তোর হবে বাপ। শেখ দিকিন ভাল করে। এ দিগরের ভেতর তুই বড় গায়ক হবি। মা তখন বলে, গুঁসাই ঠাকুর, সবই তো জানেন। আপনার চরণে এসে ঠাঁই পেয়েছি। ছেলেটা যদি তরে যায়—আপনি যা বলছেন, কি আর বলব—জন্ম জন্ম আপনার ছি-চরণের দাসী হয়ে থাকব। মা কাঁদে আর বলে, আমি অভাগিনী, আমার কেউ নেই গো তিন কূলে। ছেলেটাই সম্বল, আর আপনি ভরসা। গুঁসাই তখন বলে, খোকার মা, মহাপ্রভুকে ডাকো। আমাদের তিনিই ভরসা।

খ্যাপাচাঁদকে বসিয়ে দিদিমা এই সব গল্প শুনতেন। আর খ্যাপাচাঁদও যেন এসব গল্প করতে ভালবাসত। গাঁয়ে তার সমবয়সী সঙ্গী নেই কেউ। সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে, ভিক্ষে নিয়ে আখড়ায় ফিরে যায়।

খ্যাপাচাঁদ তার বছর চোদ্দ-পনেরো বয়স পর্যন্ত আমাদের গাঁয়ে ছিল। তখন সে আরও ভালো গায়ক। তার গান শোনার জন্য তখন লোক জমে যেত।

আমরা একবার ভাবলাম, খ্যাপাচাঁদকে নিয়ে একটা গানের আসর বসাব। কিন্তু কেউ রাজি হলো না। বলল, ধেৎ। ভিখিরি নিয়ে গানের আসর হয়?

তারপর খ্যাপাচাঁদের মা মারা গেলো আর খ্যাপাচাঁদও এখান থেকে চলে গেলো। কোথায় গেলো কে জানে।

কিন্তু গোঁসাই আছেন। তাঁর তো একজন শিষ্য নয়। আর সবাই ভিখিরিও নয়। যারা ভিখিরি নয়, তারা মাঝে মধ্যে আসর করে। আসরে গোঁসাই এসে বসে থাকেন। গায়ক তাঁকে প্রণাম করে গান গাইতে ওঠে। কিন্তু খ্যাপাচাঁদের মতো কেউ নয়। তবু যা হোক, গায়ক তো আছে গোঁসাই-এর দৌলতে। একটা ছেলে গোঁসাই-এর কাছে গান শিখতে গিয়ে আখড়ার সেই মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেলো। বলল, বিয়ে করব। গোঁসাই বললেন, তাহলে ভেক নাও। সে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়ে গেলো। বিয়ে করল। সে মজুরের কাজ করত। ছেড়ে দিয়ে বৈষ্ণব সেজে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগল। কিন্তু ভালো গায়ক হতে পারে নি। আসলে মেয়েটার টানে সে গান শিখতে গিয়েছিল। যাই হোক, লোকে বাড়ি বসে আবার গান শুনতে পেত। তারপর গোঁসাই একদিন মারা গেলেন। আখড়া ফাঁকা হয়ে গেলো। নতুন গায়ক আর তৈরি হয় না। গোঁসাই-এর অভাবে সে-সুযোগ নষ্ট।

আমরা কলেজে পড়ছি। তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীতের চর্চা শুরু হয়েছে। তার আসর বসে, জলসা হয়। শিক্ষিত ভদ্র সমাজের আয়োজন। কেমন যেন কৃত্রিম—ঠিক মন ওঠে না। যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর মতো। ওসব আজও যেন গ্রাম-জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে পারে নি। ভিখিরির সেই গানের মতো যেন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কীর্তন, দেহতত্ত্ব, বাউলাঙ্গের গান—তার আসর যদি হতো!

একবার হলো। সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক'দিন ধরে হলো। একদিন হলো বাউল গান। কলকাতার বেতার-শিল্পী সাধন দাস বাউল গাইবেন। সেদিন আসরে গ্রাম যেন ভেঙে পড়ল। লোক আর ধরে না। বাউল-বেশী সাধন দাস বাউল মঞ্চে এসে গান ধরলেন। উদাত্ত কণ্ঠ, কি সুন্দর গান!

কিন্তু বন্ধুরা এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আরে, আমাদের খ্যাপাচাঁদ বৈরাগী যে! আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আমাদের সেই পেট ভাগরা খ্যাপাচাঁদই বটে। বন্ধুরা পরামর্শ করল, ওকে ধরতে হবে। আমাদের চিনতে পারে কিনা দেখব। তুমি ওকে ধরে বলবে, আমাদের গাঁয়ে ভিক্ষে করত সেই

খ্যাপাচাঁদ না? সসঙ্কোচে বললাম, ধেৎ, তাই বলা যায় নাকি? এখন একজন বেতার-শিল্পী।

আসর ভাঙার পর সে নিচে নেমে এল। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম—খ্যাপাচাঁদ, চিনতে পারো? সাধন দাস বাউল বলল, দাদা, চেনা মানুষ কি ভুল হয়? এই গাঁয়ে আমি মানুষ। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করেছি সেই কবে থেকে। আর আপনাকে তো মনে থাকবেই। আপনার দিদিমার কাছে যে আমার আধ সের চাল বরাদ্দ ছিল। গেলেই বলতেন, বস, দু'টো গান শোনা। আর কত গল্প করতেন। আমার তো এখানে থাকারই কথা। কিন্তু মা মারা গেলো। আর গুরুদেব বললেন, এখানে থাকিস নে, তোর শিক্ষা শেষ। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। এখান থেকে চলে যা। নইলে ভিক্ষে করে জীবন কাটাতে হবে। তিনিই সব যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনিই আমার পালক-পিতা, তিনিই আমার গুরু। তাঁর শিক্ষাই আমার সম্বল, তাঁর আশীর্বাদেই আমি আজ এইখানে। খুব গুণী মানুষ ছিলেন, বড় আত্মা। আমি কিন্তু তাঁকে ভুলিনি। যতকাল বেঁচে ছিলেন, টাকা পাঠিয়েছি মাসে মাসে। তাঁর মৃত্যুর পর মচ্ছবের সময়েও এসেছিলাম। আজ এখানে এসেই আখড়ায় গিয়েছিলাম। কেউ নেই, ভোঁ ভোঁ, খুব কষ্ট হলো। ওই তো আমার ভিটে, আমার গুরুর ভিটে। গাঁ-টাকেই কেমন অন্ধকার আর অচেনা মনে হচ্ছিল। আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ হলো, আগে তো কথা বলতে সাহস হতো না। আজও হয়তো বলতাম না, যদি আপনি এসে না ডাকতেন। আমি তো সেই খ্যাপাচাঁদ বৈরাগী। আমি বললাম, না, তুমি এখন সাধন দাস বাউল। সে হেসে বলল, না দাদা, আমি সেই খ্যাপাচাঁদ বৈরাগী। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বাউল ধর্ম নাওনি? জবাব দিলো, হ্যাঁ, বাউল। তবে জাতবৈষ্ণবই আছি।

রবি বিশ্বাস কাহিনী থামিয়ে বললেন—তাহলে দেখুন, আখড়া আর গোঁসাই কোন ভূমিকা পালন করেছে গ্রাম-সমাজে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলই তাঁর গড়ে তোলা। খ্যাপাচাঁদের মতো একজনকে কোথায় তুলে দিয়েছেন।

বন্ধু শিবু পাল বললেন—সবই ভালো। কিন্তু কাজের মানুষকে কাজ ছাড়িয়ে ভিখিরি করে দেয় যে। যেমন গোঁসাই-এর জামাইকে করে দিলো। খেটে খাওয়ার জীবনকে ছেড়ে দিলো।

এবার আমাকেই কথা বলতে হলো। একটা অভিজ্ঞতার কথা শোনালাম। কৃষ্ণনগরে একটি মুচি যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার বাড়ি চাপড়া থানার এক

গ্রামে। সে-সময় লোকশিল্পীদের থোক কিছু অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল সরকার থেকে। সেটা পাবার জন্যই সে প্রার্থনা জানাতে এসেছিল। কথা প্রসঙ্গে সে বলল, বাজনা শিখব কি, মনে বড় দুঃখ, জানেন, মনের আনন্দে সন্ধ্যাবেলা ঢাক বাজিয়ে একটা নতুন বোল তুললাম। নিজেকে খুব বড় মনে হলো। কিন্তু সকালে উঠেই জনমজুর খাটতে যাওয়া। সারাদিন সেই কাজ। লোকে তো আর তখন শিল্পী ভাবে না। আমার শিল্পের জন্যই মজুরি দেয় না। আমি একজন জন-মজুর। মনে তখন খুব ঘেন্না জন্মায়। যদি শুধু ঢাক বাজিয়েই পেটের ভাতটা করতে পারতাম। নইলে আর শিল্পী হয়ে কোন লাভ? মাঝে মাঝে মনে হয়, ছেড়ে দিই। কিন্তু পারি নে, ভয় হয়। তাহলে একেবারেই গোবর হয়ে যাব।

সেই মুচি যুবক শিল্পীর বক্তব্য ও বেদনাকে আজও ভুলতে পারি নি। দেশের তামাম শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক, চিত্রীর বুকে তো এই বেদনার বাণী। ক'জন আর সৌভাগ্যের মুখ দেখেছে? আখড়ার বাবাজীর জামাই জন-মজুরি ছেড়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করে, বোধহয় শিল্পীর স্বাধীনতা সেই কিছুটা পেয়েছে। সে গায়ক হয়েছে, সেই গানকে মূলধন করেই ভিক্ষে করে। খ্যাপাচাঁদও তাই করত। তার ভাগ্যে সুযোগের শিকে ছিঁড়েছে বলে সে সাধন দাস বাউল হয়ে আসরে গান গেয়ে পারিশ্রমিক পায়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাও এদের গানেরই পারিশ্রমিক চাওয়া। এরা গায়ক—এরা শিল্পী—এরা জন-মজুর, অর্থাৎ দেহমাত্রই প্রধান পরিচয় নয়। আমার মনে হয়, এদিক থেকে ভাববার আছে। আখড়ার বাবাজীদের এই ভিক্ষাবৃত্তি প্রচলন নিছক পেটের দায়ে নয়, আলস্যে দিন কাটাবার জন্যও নয়। নিজের সাধনা নিয়ে মত্ত মগ্ন থাকার জন্যই এই সুযোগ গ্রহণ।

কিন্তু খ্যাপাচাঁদ বৈরাগী যে সাধন দাস বাউল হয়েও বলছে, আমি বৈরাগীই আছি? তাহলে সাধন দাস বাউল কি ছদ্মনাম? অথবা বাউল সম্প্রদায় জাত-বৈষ্ণব সমাজেরই একটি শাখা? এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকাতেই মনে এমন প্রশ্ন জাগে।

ঠাকমার মাসতুত বোনের একটি ছেলে ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদের কোনো গ্রামে। তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। বাল্যকালে দেখেছি। আলখাল্লা পরা, মাথায় ঝুঁটি, সঙ্গে একতারা। তিনি একবার ঠাকমাকে বলেছিলেন, একটু জমি দিন, এখানেই একটা ঘর তুলি। বাবা শুনে রেগে গেলেন। বললেন, ওসব হবে না। বলে দিও তাকে, এ বাড়িতে যেন আর না আসে। ওসব বাউল-টাউল নোংরা ব্যাপার এখানে চলবে না।

ঠাকমা বললেন—ও মা, সে যে আমার বোনের ছেলে। 'এসো না' বলব কেমন করে?

—বলতে হবে। তুমি না পারো, আমি বলব।

তারপর থেকে তিনি আর কোনদিন আসেন নি আমাদের বাড়িতে।

এরপর বাউল নিয়ে আর কোনো অনুসন্ধান করি নি। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, বাউল সমাজের সঙ্গে জাতবৈষ্ণব-সমাজের সম্পর্ক কি? দু'একটি তথ্য কানে এসেছে যে, বাউলের স্ত্রী জাতবৈষ্ণব ঘরের মেয়ে। অর্থাৎ সে বাউল, মূলে জাতবৈষ্ণব। এটা হতেই পারে। জাতবৈষ্ণবের ঘরে জন্মালেই তো সে জাতবৈষ্ণব। সে যদি নাস্তিক হয়, সে যদি বাউল-তত্ত্ব চর্চা করে, যদি শাক্ততন্ত্র চর্চা করে, তবু সে জাতবৈষ্ণব। তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে জাতবৈষ্ণব পরিবারে। তাই মনে হয়, অনেক বাউলই বোধহয় জাতবৈষ্ণবভুক্ত। এসবই আমার অনুমান নির্ভর।

॥ দুই ॥

গৃহস্থ জাতবৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গে আখড়ার বাবাজীদের সম্পর্ক এখন খুবই ক্ষীণ। বিশেষত নগরের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে সংযোগই নেই বলা যায়।

জাতবৈষ্ণব গৃহস্থ পরিবারের দীক্ষাগুরু এখন প্রায়ই ব্রাহ্মণ। তা নিয়ে গৌরব-বোধও আছে। অর্থাৎ বর্ণাশ্রমী সমাজের ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেও স্বীকৃত। ব্রাহ্মণ দীক্ষাগুরু হওয়ায় জাতবৈষ্ণবের প্রতি বর্ষিত ঘৃণা যেন তাদের প্রতি আর প্রযোজ্য নয়, এমন ভাব করেন। এঁদের জীবনযাপন-ধারাও বর্ণাশ্রমী হিন্দুর একটি বর্ণের মতোই। বৃত্তিভিত্তিক সমাজে বৃত্তি-পরিচয়হীন একটি বর্ণ। জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের মতোই রক্ষণশীল। হয়তো তার চেয়ে বেশিই।

> বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সমতার তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার ফলে বৈষ্ণবত্বের মধ্যে সংস্কারসহ ব্রাহ্মণত্বের সংক্রাম অনিবার্য হয়ে উঠল।*

মন্তব্যটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রসঙ্গে হলেও গৃহস্থ জাতবৈষ্ণবদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেকের মুখেই শোনা যাবে—আমরা তো শুদ্দুর নই। বামুনের সমান। যুক্তি দেয়, শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈষ্ণব-ভোজনও করাতে হয়। নইলে অশৌচমুক্তি হয় না। তার মানেই হলো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমপর্যায়ের।

*রমাকান্ত চক্রবর্তী: পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

বস্তুত হিন্দু সমাজ-কাঠামোর ধর্মধ্বজী দু'টি সম্প্রদায় যেন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব। যারা অন্য পরিচয় ছেড়ে শুধুই বৈষ্ণব পরিচয় সার করেছে, তারা তো নিজেদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সোচ্চার হবেই। আমার ঠাকুরমাকেই বলতে শোনা যেত—এক গুণে ব্রাহ্মণ আর অনন্ত গুণে বৈষ্ণব। আমরা বামুনের চেয়ে উঁচু।

সে-কথা কতদিন শুনেছি। এবং সেই বালককালে আকাশ-পাতাল ভেবেছি।

এইসব মানসিকতা রক্ষণশীলতাকে লালন করেছে। সদাচারীও করেছে। অনেক বৈষ্ণব পরিবারই ছিলেন নিরামিষাশী। প্রাক্‌স্বাধীনতা-কালে জাতবৈষ্ণব পরিবার মাংস ডিম পেঁয়াজ স্পর্শ করতেন না। আমাদের পরিবার অমন রক্ষণশীল না হলেও ওসব হেঁসেলে ঢুকত না। বাড়িতেও না। অনেক পরিবার মাছও খেতেন না। এমন পরিবার সংখ্যালঘু হলেও আজও আছে। তবু ছড়া চলিত আছে :

বোষ্টমা টম টম

ঝুলির মধ্যে মুরগী রেখে

মাংস খাওয়ার যম।

ঝুলির উল্লেখ থাকায় ভিক্ষাজীবী বাবাজীদের কটাক্ষ করা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। বাবাজীরা সবাই ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন, তা নয়। কিন্তু এ ছড়ার ভিতর দিয়ে সামাজিক একটা সংঘাতের ইঙ্গিত মেলে। প্রথমে বোঝা যায়, বৈষ্ণবসমাজ নিরামিষাশী ছিল, বর্ণাশ্রমী হিন্দুরা অধিকাংশই তা ছিলেন না। দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে, জাতবৈষ্ণব-সমাজকে বর্ণাশ্রমী সমাজ সুনজরে দেখত না। কারণ বর্ণাশ্রমী সমাজ থেকে বেরিয়ে-আসা মানুষ নিয়ে জাতবৈষ্ণব-সমাজের পরিপুষ্টি। এবং এরা বর্ণাশ্রম-বিরোধী। দলছুটদের কে আর সুনজরে দেখে? তাই বলা হয়েছে, জাত হারিয়ে বোষ্টম। তাই অনুমান, ব্যঙ্গ-উপহাসের আড়ালে লুকিয়ে আছে সামাজিক সংঘাতের ইতিহাস। যাই হোক, বৈষ্ণবসমাজ বেশ রক্ষণশীল ছিল। বৈষ্ণব পরিবারে ভাতকে বলা হতো 'অন্ন'। আহারকে বলা হতো 'সেবা'। তরকারি হচ্ছে 'ব্যঞ্জন'। সাধারণ ঘরে সেটা দাঁড়িয়েছিল 'ব্যানন'। সবজি বা কোনো কিছুকে কাটা বলা যাবে না, বলতে হবে 'বনানো'—'বানানো' আর কি!

তখন বালক বয়স। বিকালবেলা পথ চলতে গিয়ে দেখি, পথের পাশে ঘাসের ওপর কাদের একটা হাঁস ডিম পাড়ল। আমি ডিমটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি, নরম তুলতুলে। মনে তীব্র কৌতুহল, ডিম নরম কেন? মীমাংসার জন্য কাউকে

খুঁজতে গিয়ে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আমার পাঠশালার পণ্ডিত মহাস্ত মশায়। কোনো প্রশ্ন করার আগেই তিনি ধিক্কার দিয়ে উঠলেন—ছিঃ ছিঃ, ডিম হাতে নিয়েছিস বোষ্টমের ছেলে হয়ে! ফেলে দে। চান কর গে যা।

বিকালে স্নানের ভয়ে বাড়িতে সে-কথা আর বলি নি। কিন্তু মনের ভিতর কেমন অপরাধবোধ কাজ করেছিল। আমরা বোষ্টম, ডিম ছুঁতে নেই। পাড়ার নবশাক সমাজ থেকে আমরা ভিন্ন, স্বতন্ত্র।

প্রতিবেশীরাও এই মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য দায়ী। বসাক বাড়িতে বন্ধুর কানে সুতো—কর্ণবেধ-অনুষ্ঠান হলো সাড়ম্বরে। সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। ঢোল কাঁসি বাজছে, পুরোহিত বসে মন্ত্রপাঠ করছেন, বেলকাঠ পুড়িয়ে হোম হচ্ছে। বন্ধু মাথা ন্যাড়া করেছে, ছুঁচ দিয়ে কান ফুটো করে হলুদ মাখা সুতো পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ি ভর্তি লোক। বেশ মজা লাগছিল। দুপুরবেলা ভোজ শুরু হলো। বলা হলো, ছোটছেলেরা সব বসে পড়ো। উঠোনে বসে পদ্মপাতায় ভোজ খাওয়া। বালকের দল উঠোনে বসে পড়লাম যে যার বন্ধুর পাশে। সহসা গৃহকর্ত্রী এসে আমার কান চেপে ধরলেন। তিনি পাড়াতুতো ঠাকুমা। বললেন—ওঠ এখান থেকে।

বন্ধুদের সামনে কান ধরায় রাগ হলো। বললাম—কেন উঠব?

তিনি বললেন—এখানে বসবি নে, উঠে আয়।

মা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বললেন—ওখানেই বসুক খুড়ীমা। তাতে কি হয়েছে?

—না বৌমা, বাড়িতে শুভকাজ, কোথায় খুঁত হয়ে যাবে। বলে তিনি ঘরের বারান্দায় এনে আমাকে আসন পেতে বসিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি হচ্ছ গুরুঠাকুর, বোষ্টম। এখানে বসো।

আমার পাশে দু'জন বয়স্ক ব্রাহ্মণ বসলেন।

বিজয়া দশমীর রাতে সেকালের গ্রামে বালকদের আনন্দের বিষয় ছিল, পাড়ায় গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে প্রণাম করা এবং প্রচুর নাড়ু পকান্ন ইত্যাদি খাওয়া। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একবার বেরিয়ে পড়লাম। গৃহস্থরা পাড়া সম্পর্কে কেউ দাদা, কাকা, জ্যাঠা, কি পিসেমশায়। কিন্তু কেউ আমাকে প্রণাম করতে দেয় না, লাফিয়ে ওঠে, বলে—পাপ হবে গো। কেউ আমাকেই প্রণাম করতে আসে। মহিলারা তো গলায় আঁচল জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণামই করল আমাকে। আমি যার-পর-নাই অপ্রতিভ। লজ্জায় রণে ভঙ্গ দিলাম। আর ওপথে হাঁটি নি কোনদিন।

এসব কথা বলার কারণ এই যে, আমি বৈষ্ণব, বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র—এই ঘোষণা সমাজ থেকেই উঠে আসছে। সমাজ-মানসই আমার মনোলোককে গড়ে তুলছে, আমাকে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট হতে বলছে। আমার ধারণা, ব্রাহ্মণ সন্তানদের স্বাতন্ত্র্য-বোধও এভাবেই পুষ্ট হয়ে ওঠে। এতে যেমন অহংবোধ এবং জাত্যভিমান জন্ম দেয়, তেমনি কিছু সদাচারী ভূমিকা পালনেরও দায় বর্তায়।

জাতবৈষ্ণব-সমাজে তাই যেমন কিছু সদাচারী ভূমিকা দেখা যায়, তেমনি রক্ষণ-শীলতা এবং জাত্যভিমান দ্বারাও তা আক্রান্ত। যাঁদের ঠাকুরবাড়ি আর বিগ্রহের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে—তাঁদের তো কথাই নেই। গৃহস্থ পরিবারে বিধবা-বিবাহের প্রচলন নেই। জাতবৈষ্ণব-সমাজে কৌলীন্য বা বনেদিয়ানা বিচার হয় কে কত পুরুষের বৈষ্ণব, কোন গুরুর শিষ্য ইত্যাদি বিচারে। যে যত প্রাচীন পরিবার সে তত বনেদী।

জাতে ওঠার ব্যাপারও আছে। আমাদের পাড়ায় একটি জাতবৈষ্ণব পরিবার ছিল। তারা মাত্র এক পুরুষ এবং নিম্নবর্ণ থেকে আগত। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনশালী হয়েছে। পাড়ার মধ্যে সেরা দোতলা বাড়ি করেছে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের জেল্লাদার পোশাক। সে-বাড়ির একটি মেয়ে পাঠশালায় আমার সঙ্গে পড়ত। সে বলত—আমরা একজাত। তুই আমার বন্ধু।

সে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেত। বাড়িটা আমার খুব ভালো লাগত। আর 'একজাত' কথাটা শুনে খুব আপন মনে হতো। কিন্তু মা একদিন বললেন—ও বাড়িতে যাবি নে। ওরা নিচু। আমাদের সঙ্গে চলে না।

এই নিচু পরিবার তাদের ছেলের বিয়ে ঠিক করল এক বনেদী মহান্ত পরিবারে। প্রথমে মহান্তেরা রাজি হয় নি। কিন্তু ছেলের বাবা বলল—কোনো খরচা লাগবে না। আপনাদের দিকের যাবতীয় খরচ আমি দেবো। আপনাদের পক্ষ থেকে যা দানসামগ্রী দেবার কথা, তাও আমি কিনে দেবো। শুধু মেয়েটা চাই। মেয়ে-পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। শেষ অবধি রাজি হয়ে গেলো। বিয়ে হলো। আর নিচু পরিবার জাতে উঠে গেলো।

পরে অনুসন্ধানে জেনেছি, সেই বনেদী মহান্ত পরিবারের আদি পদবি ছিল দাস। তারপর কোনো এক সময়ে আদালতে এফিডেভিট বলে মহান্ত হয়েছে। কৃষ্ণনগরে বনেদী মহান্ত পরিবারের একজন আমাকে ওই মহান্ত পরিবার সম্পর্কে বলেছিলেন—ওঁরা খুব উঁচু—মহান্ত। আমাদের আত্মীয়।

আমি মনে মনে হেসেছিলাম।

কৃষ্ণনগরে জাতবৈষ্ণব-সমাজের অনেকেই উপবীত ধারণ করেন। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ উত্তরবঙ্গে এই প্রথার চল। বাঁকুড়া-মেদিনীপুরে ভেক প্রথা নেই। উপবীতও নেই বলেই শুনেছি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণার খবর আমার জানা নেই। তবে গোত্র একটিই—অচ্যুতানন্দ গোত্র।

গৃহস্থ পরিবারে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি দেখা যায় না। জাতি-গোত্রের খোঁজ পড়ে ছেলে-মেয়ের বিয়ের সময়। বিয়ে হয় নিজ সমাজের মধ্যেই। বর্ণাশ্রমীদের মতোই মানসিকতা। নিজের সমাজের বাইরে সম্পর্ক স্থাপনে নারাজ। বলবে, বে-জাতে বিয়ে দেবো কেন?

বর্ণাশ্রমী উচ্চবর্ণের বৈষ্ণবগুরুদের পদবি হচ্ছে: অধিকারী, আচার্য, আচারি, ভারতী, দণ্ডী, দাস, দেবাধিকারী, দেব গোস্বামী, মহান্ত, পুরী, পূজারী, পাণ্ডা, সাধু, ঠাকুর, উপাধ্যায়, ব্রজবাসী।

জাতবৈষ্ণব-সমাজের পদবি প্রধানত: বৈরাগ্য, দাস বৈরাগ্য, দাস, মহান্ত, গোস্বামী, অধিকারী, দাস অধিকারী, ঠাকুর, দাস ঠাকুর, ফৌজদার, আখড়াধারী ইত্যাদি।

উপবীতধারী ও উপবীত-বিহীন পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধা নেই এবং প্রচলিত। কারণ উপবীত বৈষ্ণবের চিহ্ন নয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবরা ভিক্ষাবৃত্তিধারী নয়। বৈষ্ণবের নির্দিষ্ট বৃত্তি-পরিচয় নেই। কারণ বৃত্তি-ভিত্তিক সমাজের বাইরে অবস্থান।

জাতবৈষ্ণব সকল পেশাতেই যুক্ত। এদের যেমন পাওয়া যাবে ভিক্ষাজীবী কি ক্ষেতমজুর হিসাবে, তেমনি মিলবে স্কুল-কলেজে শিক্ষকতায়, গবেষণাগারে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসে, দেশের কলে-কারখানায়, সরকারী দপ্তরে, আদালতে উকিল কি হাকিম বেশে, আবার সমাজসেবায় অঞ্চল-পঞ্চায়েতে কিংবা বিধায়কের ভূমিকায়, কেউ আবার ডাক্তার কি ইঞ্জিনীয়র। মেয়েরাও গবেষিকা, অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা, কেউ গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরির সন্ধানে ঘুরছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে, আখড়া ছাড়া এদের স্বতন্ত্র কোনো মঠ-মন্দির নেই। স্মৃতিগ্রন্থও নেই। এরা শুধু বর্ণাশ্রমী নয়। যে কেউ ভেক নিয়ে এই সমাজভুক্ত হতে পারে।

॥ তিন ॥

'হরিভক্তিবিলাস' নির্দেশিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মতভেদ বা বিরোধ শুরু হয়েছিল প্রথম থেকেই। মীমাংসা হয় নি কোনদিনই। ব্রাহ্মণ নেতৃত্বের প্রবল চাপে তা চাপা পড়েছে মাত্র। বিদ্রোহী কণ্ঠ সম্পূর্ণ নীরব হয় নি। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমতার দাবি উঠেছে বারংবার। মেদিনীপুরের শ্যামানন্দ সম্প্রদায় এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সচেতন ও সোচ্চার ছিলেন। তারপর কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ। কলকাতার সুবর্ণবণিক কোটিপতি মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন বৈষ্ণবদের দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করতে। দাবি ছিল, বৈষ্ণব যে কোনও বর্ণের হোক, তার সামাজিক মর্যাদা উঁচু হবে। এ বিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছিলেন।

সুবর্ণবণিক সমাজ কেন এই দাবি জানিয়েছিল? এ বিষয়ে ভাবতে গেলে ঐতিহাসিক পটভূমি মনে জাগে। সুবর্ণবণিক সমাজ আদিতে ছিল বৌদ্ধ। বৌদ্ধসমাজে তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল অতি উচ্চস্থানে। সুবর্ণবণিক সমাজ তাই বল্লালী সমাজে প্রবেশ করে নি। নিত্যানন্দের কাছে উদ্ধারণ দত্ত প্রথম আত্মসমর্পণ করেন। বৈষ্ণবীয় উদারতাকে বিশ্বাস করে। শেষে বৈষ্ণবসমাজও হলো বর্ণাশ্রমী এবং ব্রাহ্মণ হলো তার নিয়ন্ত্রক। সুবর্ণবণিক সমাজ তাই আশাহত। স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তাই অনুরোধ জানিয়েছিলেন মতিলাল শীল। কিন্তু তাঁর সে-আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসভা জানিয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকল সময়েই শূদ্র বৈষ্ণবের চেয়ে উঁচু।

মতিলাল শীল আর অগ্রসর হন নি। কিন্তু সুবর্ণবণিক জমিদার ভৈরবচন্দ্র দত্ত ১৮৩২ সালে প্রচারপত্র ছাপিয়ে তাতে সরাসরি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে লিখেছিলেন যে, বৈষ্ণব সর্বশ্রেষ্ঠ। বর্ণ যাই হোক, যে বৈষ্ণব সে-ই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের চেয়ে খাটো নয়। বৈষ্ণব হবার পর ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি অসার। এই অস্বীকৃতির ফলাফল শূন্যতা ছাড়া আর কি হবে?

জাতবৈষ্ণব-সমাজের এসব চিন্তা নেই। তারা তো বর্ণাশ্রমী নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের কৃপাভাজনও নয়। তারা নিজেদের শূদ্র ভাবে না। তারা বৈষ্ণব —বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।

গোবিন্দ দাস। সম্পর্কে বেহাইমশায়। তাঁর মেয়ের বিয়ের সময় পদবি ছিল দাস। এখন ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে হয়েছেন গোস্বামী। এটা কেমন হলো?

বললেন—গোঁসাই হয়ে গেলাম। ছেলেদের আর ওদের মার ইচ্ছায়।

—ইচ্ছায় কারণ?

—সে এক কাণ্ড। ছেলেদের এক মামা কিছুকাল আমার বাড়িতে ছিল। সে সময় প্রতিবেশী এক বনেদী ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা করে বিয়ে করে ফেলল। এখন তারা জামাইকে চাপ দিচ্ছে, দিদিকে বলো পদবি পালটাতে। ব্যস্, দিদি আর ছেলেরা লেগে পড়ল। তাই কুটুম্বর মান বাঁচাতে একেবারে গোস্বামী। বৈষ্ণব পরিচয়ও থাকল। ভবিষ্যতে ছেলেরা বামুনের ঘরে কাজ করতে পারবে।

—তাহলে আমাদের ত্যাগ করছেন?

—আপনারাও চলে আসুন। খামকা দাসখত দিয়ে পড়ে মার খাওয়া। জাতবৈষ্ণবের মান আছে নাকি? আমাদের তো সুবিধে আছে। বামুনের মতো পদবি আছে। উপবীতও ধারণ করা যায়।

—উলটো দিকটা ভেবে দেখেছেন?

—কি সেটা?

—আবার ব্রাহ্মণের খপ্পরে পড়া। আবার সেই জাতপাত, উঁচুনিচু—

বেহাইমশায় চায়ে চুমুক দিয়ে মউজ করে বসে বললেন—আপনি কে মশায়! বামুনকে রুখবে কে? বুদ্ধদেব পেরেছেন? পাঠান মোগল ইংরাজ—কেউ পেরেছে? জাতবৈষ্ণবও আর পারবে না। এদেশে ব্রাহ্মণেরই লীলা।

—কি রকম?

—বৈষ্ণব-আন্দোলনের নেতারা ব্রাহ্মণ, বিরোধীরা ব্রাহ্মণ। কলকাতার নব জাগরণের নেতারাও ব্রাহ্মণ।

—কেন, কেশব সেন, স্বামী বিবেকানন্দ?

—সেবক মাত্র। নেতা ব্রাহ্মণ। একালের বাংলা সাহিত্য সবই তো উপাধ্যায়-দের কীর্তি। পাশে ঘোষ বসু মিত্ররা আছেন—নিচের থাক। বর্ণাশ্রমকে জানান দিতে। রাজনীতিতে ডান, বাম, অতিবাম—যে কোনদিকে তাকাবেন, সর্বত্র নেতা ব্রাহ্মণ। নৈবেদ্যর ওপর তুলসীপাতার মতন। অনুসন্ধানে দেখতে পাবেন, হয়তো ডোম-ইউনিয়নের সভাপতিও ব্রাহ্মণ। গান্ধীজী মহামানব। আমৃত্যু জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, হরিজন-সেবা করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যের পরিহাস, দক্ষিণী ব্রাহ্মণ রাজা গোপালাচারী তাঁর বেহাই। আভা চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাতবৌ। সেখানে হরিজনের প্রবেশ নিষেধ।

বেহাই গোবিন্দ গোস্বামী হেসে নজরুলের গান আবৃত্তি করলেন—জাতের নামে বজ্জাতি সব।

তারপর তিনি প্রশ্ন তুললেন—বলুন, এ গান শুনে বাবুদের কত মাতামাতি, যেন রাজ্যজয় হয়ে গেলো। ক'জন জাতপাতের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছে? কত হুঙ্কার শুনি—ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। ক'জন পৈতে ছেড়েছে? ক'জন নিজে এবং আত্মীয়দের বিয়ে দিয়েছে জাতপাতকে অস্বীকার করে, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, সামাজিকভাবে? খবরের কাগজে পাত্রপাত্রী-বিজ্ঞাপন পড়ুন। কায়স্থ লিখছে—স্ব অথবা বৈদ্য কি ব্রাহ্মণ চলিবে। বৈদ্য লিখছে—কায়স্থ বা বাহ্মণ চলিবে। অন্যরা লিখছে—উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। যোগী সম্প্রদায় লিখছে—তারানাথ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বা উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। তার মানে কেউ আর নিজের সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। মিলেমিশে একাকার হতে চাইছে। সবাই নিজেকে নিচু ভাবছে। উঁচু হতে চাইছে। যেহেতু ব্রাহ্মণ সকলের ওপরে বসে আছে, তাই এখন সবাই তার নাগাল ধরতে চাইছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ লেখে না—অসবর্ণ চলিবে। কাকে সে চাইবে? ব্রাহ্মণ ছাড়া সবাই যে নিচু—শূদ্র।

—তাহলে ধর্মযোদ্ধা ব্রাহ্মণ নিজের অধিকার ঠিক বজায় রাখল?

—অবশ্যই। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে অস্বীকার করতে পারল না। কেবল জাতবৈষ্ণব-সমাজ রুখে দাঁড়িয়েছিল। শেষ অবধি হেরে গেলো।

—কেন?

—শিখদের মতো সংগঠন গড়তে পারে নি। এখন তো মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ আর বর্ণাশ্রমীদের দখলে।

—মহাপ্রভু বেদখল?

—ভেবে দেখুন, মহাপ্রভুর সে-ভক্তিধর্ম কোথায়? শাস্ত্র আর আচার-বিচারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেলো, শিবের জটায় গঙ্গার আবদ্ধ হওয়ার মতো।

—তাহলে বৈষ্ণব-আন্দোলন ব্যর্থ? সমাজ-সংহতি এল না?

—ও পথে আসা সম্ভব ছিল না।

—কোন পথে সম্ভব?

—আমাদের পথে। পদবি পালটানো, উপবীত ধারণ আর ব্রাহ্মণ সমাজে মিশে যাওয়া।

—ও তো চোরাপথ। ছলনা।

—যুদ্ধে প্রেমে নিয়ম নাস্তি। এটা তো ধর্মযুদ্ধ। এভাবে সমস্ত হিন্দুসমাজ

যদি ব্রাহ্মণ হয়ে যেতে পারে, আর কোনো সমস্যা থাকবে না। সমাজ-সংহতি নিয়েও হাহাকার করতে হবে না।

—এভাবে কি হয় ?

—হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে এভাবেই তো আর্যকরণ হয়ে আসছে। নৃতত্ত্ব তার সাক্ষ্য দেবে।

বেহাইমশায়ের কথা শুনে খুব হেসেছিলাম। কিন্তু হাসির কথা তো নয়। তাচ্ছিল্য করার উপায় নেই।

সাহিত্যিক বন্ধু নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এসে বললেন—আসতে পারি নি, ক'দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ে ছিল।

আজকাল কারো মেয়ের বিয়ে হলো শুনলে মনটা যেন স্বস্তি পায়। মনে হয়, বড় ভাগ্যবতী মেয়ে। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা উঠতেই বন্ধু বললেন—দেখলাম, বরপক্ষে খুব মোড়লি করছেন সজনী মহান্ত। বললাম, আপনি এখানে কেন ? বললেন, বর যে আমার শ্যালিকা-পুত্র।

বন্ধু হেসে বললেন—সজনী মহান্তকে চেনেন তো ?

—না। নামটা শুনেছি। কি করেন ?

—চাকরি করতেন। এখন রিটায়ার্ড। উনি কিন্তু আপনাদের মহান্ত নন।

—হতেই পারে। মহান্ত পদবি তো আমাদের একচেটিয়া নয়। কায়স্থ আছে, ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু সজনী মহান্ত কি রজনী মহান্তর কেউ ?

—দাদা।

—তাহলে তো গোলমেলে ব্যাপার হয়ে গেলো। ওদের ভগ্নীপতি যে সুধাকান্ত দাস। তাঁর বোন আমাদের ঘরের বউ। অবশ্য এমন হতে পারে যে সজনীবাবু ব্রাহ্মণ পরিবারে বিয়ে করেছেন, অথবা তাঁর শ্যালিকার বিয়ে হয়েছে ব্রাহ্মণ পরিবারে।

নিরঞ্জনবাবু হতাশ স্বরে বললেন—না, পাত্রের পদবিও মহান্ত।

পদবি মহান্ত এবং উপবীত আছে সজনীবাবুদের। সহজেই ব্রাহ্মণ বলা যাচ্ছে। কিন্তু পরিচিত পরিবেশে এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে ? কন্যাপক্ষই বা অনুসন্ধান না করে অগ্রসর হলেন কিভাবে ? বিশেষত উভয়পক্ষই যখন পশ্চিমবঙ্গীয় ? এক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, কন্যাপক্ষ জ্ঞাতসারেই অগ্রসর হয়েছেন। উপবীত আছে, পদবি মহান্ত, পাত্র সুযোগ্য। অতএব গ্রহণযোগ্য। এ যুগের সমাজ নলচের আড়াল দিয়েই তুষ্ট।

জাতবৈষ্ণব-সমাজে ইদানীং তাই দেখা যাচ্ছে, উপবীত আর পদবির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। লক্ষ্য ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি।

আমার সেই আত্মীয়, যিনি কাঁঠালপোতায় মালাচন্দন করে বিয়ে করেছিলেন, তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে চক্রবর্তী পরিবারে। ছেলে ইঞ্জিনীয়র। বিয়ে দেবেন। বললেন, অনেক সম্বন্ধ আসছে। একটা চিঠি এসেছে—এক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের ভাগ্নীকে দেখবার জন্য।

—ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ, চট্টোপাধ্যায়।

—আপনার জাত জানিয়েছেন?

—হ্যাঁ। মহান্ত। আমরা বৈষ্ণবদের ব্রাহ্মণ।

—আপনার যে পৈতে নেই!

—চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।

—চেনা কি রকম?

—আমরা মহান্ত, জামাই চক্রবর্তী। বৈষ্ণবদের বামুন ছাড়া শূদ্রের সঙ্গে কাজ করা ঠিক নয়।

—কেন?

—হিন্দুর মধ্যে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকা সম্প্রদায় তো দু'টো, ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব।

—বৈষ্ণব ছেড়ে ব্রাহ্মণে যাচ্ছেন কেন?

—দু'টো সম্প্রদায় মিশে যাওয়াই ভালো।

—তাহলে ছেলের বিয়ে বৈষ্ণবের ঘরে দেওয়া ভালো। মেয়ে ব্রাহ্মণের ঘরে। ছেলের বউ বৈষ্ণবের ঘরের।

—না। তিনি বললেন—বৈষ্ণব বলে আর পৃথক কিছু থাকা ঠিক নয়।

নিজের ছেলের বিয়ে দেবার সময়ও হলো এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। এক কন্যার পিতার চিঠি এল, দাদা, আমার মেয়েকে নিন।

মাকে বললাম—একদিন বাড়িতে নারায়ণ পুজো দেবার জন্য পুরোহিত পাও নি। যিনি সেদিন পুরোহিত-সমাজের নেতা হয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন, আজ সেই পরিবার তাঁর নাতনিকে তোমার নাতবৌ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।

মা বললেন—অমন কাজ কোরো না। সে-মেয়ে এসে মনে সুখ পাবে না।

তোমার ছেলে গিয়ে সে-বাড়িতে জামাই হিসাবে মান পাবে না। আজ লোভে পড়ে বলছে।

আমার অবশ্য তখন পাত্রী নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিল। পরে কন্যার পিতার সঙ্গে দেখা হলে বললাম—তোমাদের যখন এমনই ইচ্ছা ছিল, তবে আগে বলো নি কেন? তিনি বললেন—আগেই বলতাম, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আপনার 'দাস' পদবি। অধিকারী, মহান্ত কি গোস্বামী হলে আর দেরি করতাম না। শিক্ষা-দীক্ষা আচার-বিচারে তো কোনো ভেদ নেই আপনাদের সঙ্গে।

বৈষ্ণব-আন্দোলনের প্রথম যুগে কত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবতায় এসে ব্রাহ্মণ পদবি ত্যাগ করে দাস পদবি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। অন্যদিকে বৈষ্ণবগুরু-ব্রাহ্মণ গৃহস্থরা কেউ দাস পদবি গ্রহণ করেন নি। ফলে দাস পদবি সমাজ-জীবনে কৌলিন্যবঞ্চিত।

আমাদের শহরেরই ভদ্রলোক, একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, আত্মীয়ার বিয়ের জন্য পাত্র সন্ধানে একদিন আমার কাছে এলেন। পরিচয় হলো। বললেন—আমরা উদ্বাস্তু। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। আমি অবশ্য তখন খুব ছোট ছিলাম। আমার এখানেই পড়াশোনা।

—আপনাদের পদবি কি বরাবরই অধিকারী?

—না। আমরা দাস ছিলাম। আমিই অধিকারী।

—কেন?

—সে এক কাণ্ড। বাবা মারা গেলেন। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। প্রতিবেশীরা বলল, পদবি পালটাও। কেননা, পাড়ার মুচিরা রুইদাস লিখত, এখন দাস লিখছে। তাই আমাকে পদবি পালটাতে হবে। ওরা বলল, তুমি অধিকারী হও। তারাই সব ব্যবস্থা করে দিলো।

প্রায়ই শোনা যায়, এখন জাতপাত-বিচার নাকি গৌণ হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের মুখে নানা আস্ফালন-বাণী শুনি। সে-সব কত ফাঁকা। সমাজ চলেছে আপন পথে। জাতপাত বিষয়ে সচেতনতা বোধহয় বেড়েছে আরও। এ ঘটনা তো তারই সাক্ষ্য।

অধিকারী মশায় বললেন—আরেকটা মজার খবর শোনাই। আমার স্কুলের কাছে একজন কবিরাজ আছেন। তিনি একদিন বললেন, আমি আপনার স্বজাতীয়। বললাম, আমি তো ব্রাহ্মণ নই, বৈষ্ণব। তিনি বললেন, আমিও বৈষ্ণব। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পদবি যে বন্দ্যোপাধ্যায়? তিনি জানালেন, হ্যাঁ, আসলে কিন্তু দাস।

ওপার বাংলা থেকে চলে আসার সময় বর্ডার স্লিপ দিলো, তখন কি মনে হলো, লিখিয়ে দিলাম বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভুগছি। কাউকে বলাও যাচ্ছে না, জোচ্চোর বলবে, ব্যবসার ক্ষতি হবে। নিজের সমাজও পাচ্ছি নে।

আজ উপবীত এবং পদবি ব্রাহ্মণত্ব লাভের সহজ উপায়। সুশীল অধিকারী আমার এক আত্মীয়। একখানা নিমন্ত্রণপত্র এনে আমার হাতে দিলেন। বললেন—ছেলের ভেক দিচ্ছি, যাবেন।

জিজ্ঞেস করলাম—নিমন্ত্রণপত্রে তো ভেক লেখেন নি, উপনয়ন লিখেছেন। ভেক হবে না তাহলে?

—হ্যাঁ, ভেকই হবে। আজকাল শহরে কেউ ভেক কি ব্যাপার, বোঝে না, হাসাহাসি করে। তাই উপনয়নই লিখলাম। ব্যাপার তো একই, উপবীত গ্রহণ। আমাদের তো পৈতে আছেই। মহাপ্রভুর ভোগ দিয়ে কীর্তন করেই হবে। তবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা না করে ঘরে বসেই 'ভিক্ষাং দেহি' বলবে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা ছাড়া আর উপায় কি?

আমার ভায়রাভাইয়ের দুই ভাইয়ের ছেলেদের ভেক হলো। ওদের পদবি দাস। এবং উপবীত ধারণ প্রথা নেই। কিন্তু এক ভাইয়ের ছেলেরা উপবীত ধারণ করল। কেননা, ছেলেদের মায়ের ইচ্ছা। তাঁর এমন ইচ্ছার কারণ, তাঁর বাপের বাড়ি এবং দিদির বাড়িতে সকলে উপবীতধারী। তাঁর ছেলেদের পৈতে না থাকলে কেমন নেড়া-নেড়া লাগবে, আর নিচু মনে হবে।

ওদেরই একজন বললেন—পৈতে থাকা ভালো। মনে একটা অন্যরকম ভাব হয়।

জিজ্ঞেস করলাম—পদবি যে দাস?

বললেন—তা হোক। পৈতেধারী দাস। তার মানে উঁচু পর্যায়ের। বনেদী।

কৃষ্ণনগর কাঁঠালপোতার এক ভদ্রলোককে জানি। তিনি দাস পদবি ছেড়ে অধিকারী হয়েছেন। যুক্তি হলো, এতকাল চাকরি করতাম। এখন পুরোহিতের কাজ করি, ভোগরাগ দিই। তাই অধিকারী পদবি নিলাম।

আরেকদিন তিনি বললেন—কাকীমা কলকাতা থেকে এলেই বলতেন, তোমরা করছ কি? আমরা কবে পদবি পালটে ফেলেছি। তোমরা এখনও দাস হয়ে পড়ে আছ? ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতটা ভাবা উচিত।

এরপর তিনি হেসে বললেন—কাকীমারা বন্দ্যোপাধ্যায় পদবি নিয়েছেন কবে।

ছেলেমেয়ের বিয়ে-থা সব ব্রাহ্মণ পরিবারে। বৈষ্ণব বলে আর পরিচয় দিতে চান না।

মাতুলালয়ে পুত্রবধূ ব্রাহ্মণকন্যা।

মামা বললেন—কি করব বল? ছেলে বলল, ওই মেয়ে বিয়ে করব। কন্যাপক্ষও সম্মত। আমি আর অসম্মত হয়ে কি করব? তাছাড়া বৈষ্ণবের আবার জাত-বিচার কি? হরি বলে যে আসবে, সে-ই আমাদের স্বজন। কিন্তু বামুনরাও এগিয়ে এল। এখন তাদের পারিবারিক যাবতীয় কাজে কুটুম্ব হিসাবে নিমন্ত্রণ করে। আমরা ডাকলে ছুটে আসে।

মামা অসুস্থ হলেন। মৃত্যুশয্যায়। প্রায় প্রত্যহ সকালে গিয়ে খানিক মাথার কাছে বসে থাকতাম। মামা তখন শোনাতেন, ব্রাহ্মণকে যে সম্মান করি, বর্ণশ্রেষ্ঠ বলি, সেটা অকারণ নয়, শিক্ষাদীক্ষা কত ভালো। বৌমাই তার প্রমাণ। সংসার মাথায় করে রেখেছে। আমার কি সেবা-যত্নই না করছে। ব্যাজার ভাব নেই। সব হাসিমুখে করে।

মামার মৃত্যু হলো। তার শ্রাদ্ধবাসরে গিয়ে দেখা গেলো, বৈদিক মতে কাজ হচ্ছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করছেন। মাতুলপুত্র সামনে আসনে উপবিষ্ট। তার শ্বশুর অর্থাৎ মামার ব্রাহ্মণ বৈবাহিক অনাবৃত দেহে গলায় উপবীত ঝুলিয়ে শ্রাদ্ধকর্ম তদারক করছেন। মাতুলপুত্র হাতে পিণ্ড তুলে নিয়েছে। পিতৃ-প্রেতাত্মাকে দেবার জন্য। শ্বশুর দেখিয়ে দিচ্ছেন, কেমন করে হাত গলিয়ে সেটা নামিয়ে দিতে হবে।

মামীমাকে বললাম—পিণ্ডদান হলো। মহাপ্রভুর ভোগ হলো না?

মামীমা মুখে আঙুল চাপা দিয়ে চুপ করতে বললেন। তারপর জানালেন—ঘরে বামুনের মেয়ে। তার বাবাই সব ব্যবস্থা করেছে। ছেলে বলছে, এটাই ভালো। আমরা আর বোষ্টম থাকব না।

হাসলাম। আর্যকরণের এও তো এক প্রক্রিয়া।

তবু জাতবোষ্টম সমাজ থাকবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ রাতারাতি ভোল বদল করে ফেলবে কেমন করে? করবেই বা কেন?

তবে এখন স্বাধীন দেশ। জাতীয় সরকার। মানব কল্যাণের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে।

১. অস্পৃশ্যতা আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে।

২. জাতপাত-সম্প্রদায়-ভেদাভেদ-মানসিকতার বিরুদ্ধে সরকার এবং রাজনৈতিক দলসমূহ প্রচাররত।

৩. রেজেষ্ট্রি বিবাহপ্রথার প্রচলন হয়েছে। মালাচন্দনের বিয়ের চেয়েও সরল ব্যবস্থা। বর-কনেকে সাজতেও হবে না। জাতি-ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সাবালক-সাবালিকা হলেই বিবাহ করতে পারবে। কন্যা, কুমারী বিধবা ডিভোর্সী, যাই হোক।

৪. গর্ভপাত আইনসিদ্ধ। জারজদের জন্য, অনাথ পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য স্থাপিত হচ্ছে শিশুমঙ্গল কেন্দ্র।

৫. বিপন্ন অসহায় নারীদের জন্য হচ্ছে উদ্ধারাশ্রম, অনাথ আশ্রম, নারী-কল্যাণ আশ্রম।

৬. যারা অসহায়, আর্থসামাজিক কারণেই যাদের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া গতি নেই, তাদের জন্য খোলা হয়েছে সরকারী খয়রাতি সাহায্য ভাণ্ডার। সরকার ভিক্ষা দেবে তাদের।

জাতবৈষ্ণবের সমস্ত ভূমিকাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সরকারই যেন আজ জাতবৈষ্ণবে পরিণত। তাহলে জাতবৈষ্ণব-সমাজ থাকার আর প্রয়োজনই বা কি?

তবু জাতবৈষ্ণব-সমাজ আছে। বয়ে চলেছে আপন খাতে। তাদের গোত্র অচ্যুতানন্দ। তারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমতার দাবিদার। দৈনিক পত্রিকার পাত্র-পাত্রী বিভাগে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করলেই তা অনুমান করা যাবে।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমতার দাবি শুধু পূজার্চনার অধিকারের ক্ষেত্রেই নয়, তা প্রসারিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও। গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই।

সংশোধনী : ৯৩ পৃষ্ঠার শেষ সারিতে 'ক্ল্যাট'-এর পরিবর্তে 'ফ্ল্যাট' পড়তে হবে।

নির্ঘণ্ট